পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র

অনুপম হায়াৎ

ঢাকা যেমন বাংলাদেশের প্রশাসনিক রাজধানী তেমন চলচ্চিত্র সংস্কৃতিরও রাজধানী। ১৮৯৬ থেকে ১৯৬০ সাল পর্যন্ত নগর ঢাকায় বিনোদন ও সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবে চলচ্চিত্রের প্রদর্শন, নির্মাণ, পরিবেশনা, প্রভাব, চিন্তার ও সমকালীন খ্যাতিমান ব্যক্তিদের উপভোগ-প্রতিক্রিয়া এ গ্রন্থের বিষয়। পুরানো, আবছা মলিন, বিবর্ণ সাদাকালো, রূপালি-সোনালী ফ্রেমের স্মৃতিময় দালিলিক উপস্থাপনা।

চলচ্চিত্র অনুরাগী ও গবেষকদের জন্য এ গ্রন্থ দিতে পারে নতুন তথ্য ও সত্যের আভাস।

প্রচ্ছদ: নিয়াজ চৌধুরী তুলি

নিমর
মিলোং . ২০১৫

বইপত্র

অনুপম হায়াৎ (মতিউর রহমান ভূঁইয়া)-এর জন্ম ১ জুন ১৯৫০, নারায়ণগঞ্জ। শিক্ষাগত যোগ্যতা: এম. এ. (সাংবাদিকতা), ডিএইচএম.এ.সি (চলচ্চিত্র)। চলচ্চিত্র, নজরুল, বাঙালি মণীষীদের জীবন চরিত, ঢাকার সংস্কৃতি, গণমাধ্যম তাঁর লেখালেখি ও গবেষণার প্রধান ক্ষেত্র। প্রকাশিত গ্রন্থ ২৩টি। উল্লেখযোগ্য হলো- 'সপুংশক অহংকার' (১৯৮০), 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস' (১৯৮৭), 'নাট্যকার নজরুল' (১৯৯৭), ফতেহ লোহানী (১৯৯৪), সৈয়দ মোহাম্মদ তৈফুর (১৯৯৫), মেহেরবানু (১৯৯৭), 'চলচ্চিত্রজগতে নজরুল' (১৯৯৮), দোলন চাঁপার হিন্দোল (১৯৯৮), বাংলাদেশের কয়েকজন চলচ্চিত্রকর্মী (১৯৯৯), পুরানো ঢাকা সংস্কৃতিক প্রসঙ্গ' (২০০১), 'চলচ্চিত্র বিদ্যা' (২০০৪), 'চলচ্চিত্র সমালোচনা' (২০০৬), 'জহির রায়হানের চলচ্চিত্র ঃ পটভূমি, বিষয় ও বৈশিষ্ট্য' (২০০৭), চিত্রনাট্যকলা (২০০৭), রবীন্দ্রনাথ ও চলচ্চিত্র (২০০৮), পুরানো ঢাকার রাজনীতি ও অন্যান্য (২০০৮), প্রামাণ্য নজরুল (২০০৮) প্রভৃতি।

টিসিবির সাবেক উর্ধ্বতন কার্যনির্বাহী (রপ্তানি, পর্ষদ, জনসংযোগ ও বাজার তথ্য), ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক, চলচ্চিত্র সেন্সর বোর্ডের সদস্য, চলচ্চিত্র জুরি বোর্ডের সদস্য এবং স্ট্যামফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের 'ফিল্ম এ্যান্ড মিডিয়া' বিভাগসহ বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ, ঢাকা ফিল্ম ইনসটিটিউট, জাতীয় গণমাধ্যম ইনসটিটিউট, বাংলাদেশ ইনসটিটিউট অব কমুনিকেশন এ্যান্ড পাবলিক রিলেশনসের শিক্ষক, বহু পুরস্কারপ্রাপ্ত।

পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র
(১৮৯৬-১৯৬০)

পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র

(১৮৯৬-১৯৬০)

পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র

(১৮৯৬-১৯৬০)

অনুপম হায়াৎ

ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ

পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র (১৮৯৬-১৯৬০)

অনুপম হায়াৎ

স্বত্ব
লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৯

প্রকাশক
ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ
কম্পিউটার কমপ্লেক্স মার্কেট
৩৮/৩ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
ফোন : ৭১২৪৭৬০, ০১৭১৫ ৪২৮২১০, ০১৭১২ ২৩৫৩৪২
e-mail : ittadisutrapat@yahoo.com

প্রচ্ছদ
নিয়াজ চৌধুরী তুলি

অক্ষরবিন্যাস
বন্ধু কম্পিউটার্স

মুদ্রণ
নিউ এস আর প্রিন্টিং প্রেস
৩৪ শ্রীশদাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য
১২০ টাকা

ISBN : 984 70289 0018 6

উৎসর্গ

নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার উপজেলার উজান গোপিন্দী গ্রামের
চাচা আবু ভূঁইয়া (মরহুম)
চাচা মনরদ্দীন ভূঁইয়া (মরহুম)
ফুফু জয়তুন নেসা খাতুন (মরহুম)
ফুফাতো বোন শাহেরা খাতুন (মরহুম)
মামাতো ভাই আহমদ আলী মোল্লা (মরহুম)
মামাতো বোন আনোয়ারা বেগম (মরহুম)
যাঁদের কাছে আমার ঋণ অপরিসীম

সূচিপত্র

ভূমিকা / ৯

১ম অধ্যায়

ঢাকায় বায়োস্কোপ প্রদর্শনের ১০০ বছর / ১৫
ক্রাউন থিয়েটারে বায়োস্কোপ প্রদর্শনী / ১৭
জগন্নাথ কলেজে বায়োস্কোপ প্রদর্শনী / ২২
আহসান মঞ্জিলে রয়্যাল বায়োস্কোপ প্রদর্শনী / ২৩

২য় অধ্যায়

প্রেক্ষাগৃহের কথা / ২৯
নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মাণ পর্ব (ব্রিটিশ যুগ) / ৪০

৩য় অধ্যায়

সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ পর্ব (দেশ বিভাগোত্তর) / ৪৯
পরিবেশনা সংস্থা / ৫৮
চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা / ৫৯
চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা / ৬০
কয়েকটি চলচ্চিত্র পত্রিকা / ৬২

৪র্থ অধ্যায়

স্মৃতিময় চলচ্চিত্র / ৬৬
খাজা মওদুদের দেখা চলচ্চিত্র / ৬৬
খাজা শামসুল হকের দেখা চলচ্চিত্র / ৬৭
কাজী শামসুল হকের দেখা চলচ্চিত্র / ৭১
বুদ্ধদেব বসুর দেখা চলচ্চিত্র / ৭৯
ভবতোষ দত্তের দেখা চলচ্চিত্র / ৮০
যোবায়দা মির্জা দেখা চলচ্চিত্র / ৮১
কিরণ শংকর সেনগুপ্তের দেখা চলচ্চিত্র / ৮৮
সরদার ফজলুল করিমের দেখা চলচ্চিত্র / ৯০
সনজিদা খাতুনের দেখা চলচ্চিত্র / ৯১
ক.আ.ই.ম. নূরুদ্দীনের দেখা চলচ্চিত্র / ৯৩
রাবেয়া খাতুনের দেখা চলচ্চিত্র / ৯৬
আহমদ রফিকের দেখা চলচ্চিত্র / ৯৬
আসিরুদ্দীন আহমেদের দেখা চলচ্চিত্র / ৯৮

ভূমিকা

ঢাকা যেমন ভৌগোলিক ও রাজনৈতিভাবে বাংলাদেশের রাজধানী তেমন বাংলাদেশের চলচ্চিত্র সংস্কৃতিরও রাজধানী বিশ শতকের একেবারে শেষপ্রান্তে দেশের প্রায় দেড় হাজার প্রেক্ষাগৃহে প্রতি বছর গড়ে যে ৭০/৭৫টি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র মুক্তি পায় তা ঢাকার এফডিসি হতেই উৎপাদিত। ঢাকায় চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তন হয় ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর। এর প্রায় ৩০/৪০ বছর আগে অবিভক্ত ভারতীয় উপমহাদেশের কোলকাতা, বোম্বে, লাহোর ও মাদ্রাজ শহরে চলচ্চিত্র শিল্পের গোড়াপত্তন হয়। ঢাকায় দেরিতে চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে ওঠার কারণ রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। অথচ সেই উনিশ শতকের একেবারে শেষ দশকে যখন বোম্বে-মাদ্রাজ-কোলকাতা শহরে বায়োস্কোপ বা চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয় তখন তা ছড়িয়ে পড়ে মফস্বল শহর ঢাকায়। ওই সময় অর্থাৎ ১৮৯৬-৯৮ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতার পাশাপাশি ঢাকাতে প্রদর্শিত হয় বায়োস্কোপ। শুধু ঢাকা নয়, প্রায় একই সময়ে সুদূর দ্বীপশহর ভোলার এসডিও'র বাংলোতে, বিজ্ঞানের অষ্টম আবিষ্কার বায়োস্কোপ দেখানো হয়। কিন্তু কোলকাতার সমসাময়িককালে ঢাকা তথা পূর্ববঙ্গে বায়োস্কোপ প্রদর্শিত হলেও উৎপাদন দিক দিয়ে ঢাকা পিছিয়ে পড়ে।

১৮৯৬ থেকে ১৯৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ঢাকায় কোনো চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে ওঠেনি। তবে মাঝখানে বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা হিসেবে তৈরি হয়েছে কয়েকটি স্বল্পদৈর্ঘ্য ও পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র। এসবের মধ্যে রয়েছে নওয়াব পরিবারের উদ্যোগে নির্মিত স্বল্পদৈর্ঘ্য নির্বাক চিত্র 'সুকুমারী' (১৯২৭-২৮), পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্বাক চিত্র 'দি লাস্ট কিস বা শেষ চুম্বন' (১৯৩১), সবাক তথ্যচিত্র 'ইন আওয়ার মিডস্ট' (১৯৪৮), প্রামাণ্যচিত্র 'সালামত' (১৯৫৪), প্রামাণ্যচিত্র 'বন্যা' (১৯৫৪), প্রচারচিত্র 'চাকা' (১৯৫৫), প্রামাণ্যচিত্র 'আপ্যায়ন' (১৯৫৪), প্রথম সবাক পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র 'মুখ ও মুখোশ' (১৯৫৬)। ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দে সরকারি উদ্যোগে এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হলে ঢাকা তথা বাংলাদেশে চলচ্চিত্র শিল্পের ভিত্তিভূমি স্থাপিত হয়।

কিন্তু ঢাকায় দেরিতে চলচ্চিত্র নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠলেও ঢাকায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের রয়েছে পুরানো ইতিহাস, যা পৃথিবীর প্রায় সব দেশের গুরুত্বপূর্ণ

শহর ও নগরের মতোই সমসাময়িক। তবে ১৮৯৬ থেকে ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় চলচ্চিত্র প্রদর্শনের কোনো তথ্যভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ রেকর্ড নেই। তথ্যের স্বল্পতার কারণে আমরা ঢাকার সমাজ ও বিনোদন জীবনে এই মাধ্যমটি কি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল তা জানতে পারিনি। ঢাকার বিভিন্ন দিক নিয়ে গবেষণা হয়েছে, লেখালেখি হয়েছে, আলোচনা-সেমিনারও হয়েছে, কিন্তু ঢাকার বায়োস্কোপ বা চলচ্চিত্র নিয়ে ধারাবাহিক ও তথ্যবহুল বিস্তারিত কোনো কাজ হয়নি বললেই চলে।

ঢাকার বায়োস্কোপ প্রদর্শন (১৮৯৮) সম্পর্কে সম্ভবত প্রথম একটি প্রবন্ধ 'ঢাকায় বায়োস্কোপের ইতিকথা' রচনা করেন গবেষক মুনতাসীর মামুন, যা প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায় ১৪ অশ্বিন, ১৯৮৫ তারিখে। বিশিষ্ট অভিনেতা জাফরী পাকিস্তান অবজারভার-এ ১৯৫৮ সালের ৩০ মে 'ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রি ইন ইস্ট পাকিস্তান' নামে একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রবন্ধ লিখেন। এতে ঢাকার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র 'দি লাস্ট কিস' প্রসঙ্গটি ঠাঁই পায়। ১৯৬৭ সালের ৭ অক্টোবর দৈনিক পাকিস্তানের 'চলচ্চিত্র, বেতার ও টিভি সংখ্যা' প্রকাশিত হয়। এতে ঢাকার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য চিত্র 'দি লাস্ট কিস' এর প্রধান সংগঠক ও নায়ক খাজা আজমলের সাক্ষাৎকারভিত্তিক নিবন্ধ প্রকাশিত হয়। এতে ছবিটি সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশিত হয়।

১৯৬৯ সালে প্রকাশিত হয় আলমগীর কবির রচিত 'দি সিনেমা ইন পাকিস্তান' গ্রন্থ। এটি ছিল তৎকালীন পাকিস্তানের চলচ্চিত্রের ইতিহাস নির্ভর প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ। এ গ্রন্থে ঢাকার চলচ্চিত্রের ইতিহাস ও বৈশিষ্ট্য নিয়ে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য এবং বিশ্লেষণ থাকলেও বায়োস্কোপের আবির্ভাব, প্রথম ছবি 'দি লাস্ট কিস' এবং প্রেক্ষাগৃহের উৎপত্তি সম্পর্কে কোনো তথ্য ছিল না।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পরপরই ফরিদ উদ্দিন নীরদ রচিত 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র' নামে একটি গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এতে ঢাকার চলচ্চিত্রজগতের বিভিন্ন প্রসঙ্গ ঠাঁই পায়। ১৯৭৮ সালের ২৩ জুন সাপ্তাহিক 'বিচিত্রা'য় প্রকাশিত 'স্মৃতির মুখ ঃ হারানো ছবি' নামে এক অনুসন্ধানী ও বিস্তৃত প্রতিবেদনে ঢাকার প্রথম ছবি নির্মাণের প্রসঙ্গটি প্রামাণ্যভাবে তুলে ধরার চেষ্টা করি। মুনতাসীর মামুন ও আমার লেখার সূত্র ধরে আক্তারুজ্জামান ১৯৭৮ সালে 'চিত্রালী'র ২৫তম বর্ষ শুরু সংখ্যায় 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ক্রমবিকাশের ধারা' নামে বিস্তৃত প্রবন্ধে ঢাকার চলচ্চিত্রের অনেক অজানা তথ্য তুলে ধরেন।

বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদ-এর ১৯৮৫ সালের সংকলন 'ধ্রুপদী'তে প্রকাশিত হয় আমার লেখা প্রবন্ধ 'ঢাকার ছবির নির্বাক যুগ' এতে শুধু ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র নির্মাণের (১৯২৭-৩১) উদ্যোগ আলোচিত হয় ঢাকার চলচ্চিত্র

বিশেষ করে ত্রিশের দশকে ঢাকায় প্রেক্ষাগৃহে নিজের দেখা বিভিন্ন চলচ্চিত্র সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ দিয়েছেন যোবায়দা মির্জা তার লেখা 'তিরিশের দশকে ঢাকায় সিনেমা দেখা' নামক এক প্রবন্ধে। প্রবন্ধটি ছাপা হয় বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সংসদের 'চলচ্চিত্র পত্র'-এর ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৮৭ সংখ্যায়।

১৯৮৭ সালে এফডিসির উদ্যোগে প্রকাশিত হয় 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস' নামে সুবিশাল সচিত্র প্রামাণ্য গ্রন্থ। এ গ্রন্থের গুরুত্বপূর্ণ একটি অধ্যায়ের নাম 'পুরানে ঢাকায় চলচ্চিত্র'। এতে ঢাকায় প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী, হীরালাল সেনের অবদান, প্রেক্ষাগৃহ, চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান, চিত্রসাংবাদিকতা ইত্যাদি বিষয় আলোচিত হয়। গ্রন্থটির তথ্য ও নিদর্শন সংগ্রহ করতে আমার প্রায় দশ বছর সময় লাগা সত্ত্বেও ঢাকার চলচ্চিত্র অঙ্গনের অনেক কিছু বাকি থেকে যায়।

এশিয়াটিক সোসাইটি ১৯৮৯ সালে 'ঢাকা অতীত বর্তমান ভবিষ্যৎ' নামে এক আন্তর্জাতিক সেমিনারের আয়োজন করে। এ সেমিনারে আমন্ত্রিত হয়ে 'ঢাকার আলোকচিত্র ও চলচ্চিত্র' নামে একটি প্রবন্ধ উপস্থাপন করি। এর ফলে দুটি বিষয়ই সুধীজনদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং উৎসাহবোধ করি। চলে আরো অনুসন্ধান। চলচ্চিত্র নিয়ে গবেষণা করার সূত্রেই ঢাকার সমাজ, অর্থনীতি, রাজনীতি, সংস্কৃতি সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যের সন্ধান পাই বিভিন্ন পারিবারিক ডায়েরি, অ্যালবাম, প্রবীণদের সাক্ষাৎকার, মুদ্রিত বই-পুস্তক, পত্রপত্রিকা, স্মৃতিকথা ও আত্মজীবনী থেকে। কখনো কখনো পেয়েছি ঢাকার বায়োস্কোপ সম্পর্কে মূল্যবান তথ্যও। নওয়াব পরিবারের খাজা শামসুল হক ও খাজা মওদুদের ডায়েরিতে পেয়েছি ১৯১১ থেকে ১৯৫০ সাল পর্যন্ত এবং কাজী শামসুল হকের ডায়েরিতে পেয়েছি ১৯২৫ থেকে ১৯৪০ সাল পর্যন্ত তাদের দেখা বিভিন্ন চলচ্চিত্রের নাম। এছাড়াও বুদ্ধদেব বসু, ভবতোষ দত্ত, কিরণশংকর সেনগুপ্ত, সরদার ফজলুল করিম, আসিরুদ্দীন আহমদ, রাবেয়া খাতুন, কবীর চৌধুরী, শামসুর রাহমান, মমতাজউদ্দীন আহমদ প্রমুখের বিভিন্ন লেখায় পুরানো ঢাকার ছায়াছবি সম্পর্কে পেয়েছি তথ্য। ঢাকা প্রকাশ, সোনার বাংলা, চাবুক, বাংলার বাণী, আমান, শান্তি, অগত্যা, সিনেমা, উদয়ন, রূপছায়া, চিত্রালী, সন্ধানী, মৃদঙ্গ, মাহেনও, রমনা, চিত্রাকাশ, চলন্তিকা, পাকিস্তান অবজারভার প্রভৃতি পত্রপত্রিকা ঘেটেও ঢাকার চলচ্চিত্র সম্পর্কে অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পেয়েছি।

বিভিন্ন সূত্র থেকে ঢাকার চলচ্চিত্র সম্পর্কে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই রচিত হয়েছে 'পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র' শীর্ষক এ গ্রন্থটি।

আগেই বলা হয়েছে, ঢাকায় চলচ্চিত্র চালু হয়েছিল উনিশ শতকের একেবারে শেষদিকে— ব্রিটিশ আমলে। তখন বায়োস্কোপ প্রদর্শিত হতো

নাট্যগৃহ, শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, আহসান মঞ্জিলে। বিশ শতকের প্রথম দশক পর্যন্ত অভিজাত, ধনী, জমিদার, নওয়াবরা ছিল মূলত বায়োস্কোপের দর্শক ও পৃষ্ঠপোষক। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় নিয়মিতভাবে বায়োস্কোপ প্রদর্শনের জন্য স্থাপিত হয় স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ আরমানীটোলায়। তখন থেকে নাটক, যাত্রা ও নাচ-গানের পাশাপাশি বায়োস্কোপ হয়ে ওঠে ঢাকার সাধারণ মানুষের বিনোদনের অংশ।

১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দের ১৪ আগস্ট ঢাকা স্বাধীন রাষ্ট্র পাকিস্তানের পূর্ববঙ্গ প্রদেশের রাজধানীর মর্যাদা পায়। ওই সময় পর্যন্ত ঢাকার ৭/৮টি প্রেক্ষাগৃহে চলতো কোলকাতা, বোম্বে, মাদ্রাজ, লাহোর, করাচি, হলিউড, ব্রিটেন, ফ্রান্স, ইতালিতে নির্মিত বিভিন্ন চলচ্চিত্র। এসব চলচ্চিত্র যেমন ঢাকাবাসীকে বিনোদিত করেছে; তেমন এসবের গান, অভিনয়, পাত্র-পাত্রী জনজীবনকে করেছে প্রভাবিত। জনপ্রিয় তারকাদের ফ্যাশন অনেককে করেছে প্রভাবিত, ব্যবসায়ীরা তারকাদের নামে বের করেছে পণ্য। সত্যেন সেনের 'শহরের ইতিকথা' গ্রন্থ থেকে জানা যায় যে, সেকালের জনপ্রিয় অভিনেত্রী যোবায়দার (প্রথম সবাক চিত্র আলম আরা খ্যাত) নামে বিড়িও চালু হয়েছিল। অনেকে প্রিয় তারকাদের কথা স্মরণে রেখে খুব সেজেগুজে, এমনকি গায়ে সুগন্ধি মেখে প্রেক্ষাগৃহেও যেতো। ওই সময় ছবি দেখার ব্যাপারটিও অনেক পরিবারের মধ্যে 'উৎসব' মনে করা হতো। দলবেঁধে, সবাই মিলে ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়া ছিল এক মহা আনন্দের ব্যাপার তবে কোনো কোনো পরিবার বা অভিভাবকদের দৃষ্টিতে বায়োস্কোপ দেখা ছিল অপরাধতুল্য।

ওই সময় আজকের মতো এতো পত্রপত্রিকা, রেডিও, টিভির সুযোগ ছিল না। তাই ছায়াছবির প্রচারের ব্যাপারটিও ছিল বেশ মজার। একজন লোক পোস্টার, ব্যানার হাতে ঢাক-ঢোল বাজিয়ে মহল্লা মহল্লায় রাস্তা ধরে যেতো, কখনো কখনো ছড়াতো হ্যান্ডবিল আকর্ষণীয় স্লোগান ও ভাষাসহ।

১৯৪৭ সালের রাজনৈতিক বিভাজনের পর ঢাকার চলচ্চিত্র দর্শকদের কাছে একদার 'স্বদেশী তারকারা'ও হয়ে পড়ে 'বিদেশী'। ১৯৫৯ সাল থেকে ঢাকার দর্শকরা ঢাকায় নির্মিত চলচ্চিত্র দেখার সুযোগ পায় এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর। শুরু হয় নতুন ঢাকার নতুন চলচ্চিত্র শিল্পের যাত্রা। তবে এ যাত্রা অবশ্যই কুসুমাকীর্ণ ছিল না। পাকিস্তানি এবং অস্থানীয় চিত্র ব্যবসায়ীরা কখনো চায়নি ঢাকায় চিত্রশিল্প গড়ে উঠুক। ত্রিশ দশকে নওয়াব পরিবারের কয়েকজন 'দি লাস্ট কিস' চলচ্চিত্র নির্মাণ করে একবার দুঃসাহসের পরিচয় দিয়েছিলেন। আবার পঞ্চাশের দশকে আবদুল জব্বার খান দ্বিতীয়বার দুঃসাহসের পরিচয় দেন 'মুখ ও মুখোশ' বানিয়ে এ দুটি উদ্যোগই ছিল

স্টুডিও ল্যাবরেটরি এবং সুযোগ-সুবিধাহীন পরিবেশে অপেশাদারী প্রচেষ্টা। অস্থানীয় উর্দু ভাষী চলচ্চিত্র ব্যবসায়ীদের কেউ কেউ এমন অভিযোগ করেছিল যে, এ দেশের আর্দ্র আবহাওয়া চলচ্চিত্র নির্মাণের উপযোগী নয় অথচ ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠার মাত্র দু'বছর সময়ের মধ্যেই ঢাকায় নির্মিত ছবি 'জাগো হুয়া সাভেরা' আন্তর্জাতিক বলয়ে পুরস্কার-প্রশংসা পেয়ে রেকর্ড সৃষ্টি করে। সেসব অবশ্যই সেকালের ঢাকায় চলচ্চিত্রের গৌরবময় ইতিহাস

অবশেষে 'পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র' গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হলো। এ গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীতে ১৯৯৮ হতে ২০০৮ সাল পর্যন্ত আটকে ছিল। শেষ পর্যন্ত *ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ*-এর স্বত্বাধিকারি আদিত্য অন্তর ও জহিরুল আবেদীন জুয়েলের কল্যাণে এটি আলোর মুখ দেখতে পেল। এ জন্য আমি তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ। পাণ্ডুলিপির অংশবিশেষ ইতোপূর্বে বরুণ শংকরের সহায়তায় 'প্রতিচিত্র' পত্রিকায় ছাপা হয়েছে। বইটি প্রকাশের ব্যাপারে সহায়তা পেয়েছি তরুণ লেখক অপূর্ব কুমার কুণ্ডুর কাছ থেকে। আলোকচিত্র শিল্পী মনোয়ার আহমদ এবং মৃদুল সাহা এবং অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত আলোকচিত্র গ্রন্থে ব্যবহার করা হয়েছে। 'পুরানো ঢাকায় চলচ্চিত্র' গ্রন্থটি পাঠক মহলে সমাদৃত হলেই আমার শ্রম সার্থক হবে। গ্রন্থের ব্যাপারে যে কোনো পরামর্শ সাদরে গৃহীত হবে

অনুপম হায়াৎ

সুবর্ণ গ্রাম
৩৩/৪ পলাশপুর, জিয়া সরণি
ধনিয়া, ঢাকা-১২৩৬

প্রথম অধ্যায়

ঢাকায় বায়োস্কোপ প্রদর্শনের ১০০ বছর

ঢাকা তথা বাংলাদেশে প্রথম কবে বায়োস্কোপ প্রদর্শন করা হয়? আমরা যদি সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিলের বিজ্ঞাপনটি ধরি তাহলে বাংলাদেশে বায়োস্কোপ প্রদর্শনের শতবর্ষ পূর্ণ হয় ১৯৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল। আর যদি চলচ্চিত্র লেখক-গবেষক গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ পরিবেশিত তথ্য সঠিক বলে ধরে নেই তাহলে ১৯৯৬ সালেই পূর্ণ হয়েছে ঢাকা তথা বাংলাদেশে বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর একশ' বছর।

গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ তার 'সোনার দাগ' গ্রন্থে লিখেছেন : ১৮৯৬ সাল। হাতিবাগানে (কলকাতা) তখন স্টার থিয়েটার শুধু তৈরিই হয়নি, নাট্যশালা হিসেবে রীতিমতো জমেও উঠেছে। নাটকের পর নাটক হচ্ছে তখন এ স্টারে ... এমন সময় কলকাতায় এলেন স্টিফেন্স। সোজা গিয়ে উঠলেন স্টার থিয়েটারে।... বললেন, আমি কোলকাতাবাসীদের কাছে একটি নতুন জিনিস উপহার দিতে এসেছি... কি জিনিস! বায়োস্কোপ।[২]

অতঃপর স্টার থিয়েটারের কর্ণধারদের পক্ষ থেকে প্রচারিত একটি হ্যান্ডবিল ছড়িয়ে পড়েছিল শহরে। হ্যান্ডবিলের বক্তব্য ছিল এ রকম :

'পৃথিবীর অষ্টম আশ্চর্য! বায়োস্কোপ! আসুন! দেখুন! যাহা কেহ কখনও কল্পনাও করেন নাই তাহাই সম্ভব হইয়াছে! ছবির মানুষ, জীবজন্তু, প্রাণীর ন্যায় হাঁটিয়া-ছুটিয়া-চলিয়া বেড়াইতেছে...।'

সবাই বিস্ময়ে দেখলেন স্টিফেন্স সাহেবের বায়োস্কোপ।[৩] গৌরাঙ্গপ্রসাদ ঘোষ এ প্রসঙ্গে অবিভক্ত বাংলার প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শক হিসেবে সেন্ট জেভিয়ার্স কলেজের পাদ্রী অধ্যাপক ফাদার ল্যাঁফোর নাম উল্লেখ করেছেন। তিনি কলেজের ছাত্রদের বায়োস্কোপ নামের যন্ত্রটি প্রথম দেখান। তবে তার প্রদর্শনী বাণিজ্যিক ছিল না, ছিল ক্লাসে সীমাবদ্ধ। আর স্টিফেন্স এসেছিলেন সারা বাংলাদেশে এ বায়োস্কোপ দেখিয়ে একটা আলোড়ন তুলতে। বলে নেয়া দরকার, স্টার থিয়েটারের সঙ্গে গিয়ে ঢাকাতেও এ বায়োস্কোপ দেখিয়ে এসেছিলেন মিস্টার স্টিফেন্স।[৪]

গৌরাঙ্গপ্রসাদ পরিবেশিত এ তথ্য অনুযায়ী ঢাকা তথা বাংলাদেশে বায়োস্কোপ প্রদর্শনের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দে। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ এ ব্যাপারে আর কোনো বিস্তারিত তথ্য দেননি। এ কারণে আমরা বায়োস্কোপ প্রদর্শনের তারিখ, স্থান ও প্রদর্শিত বিষয় সম্পর্কে জানতে পারি না।

অবিভক্ত বাংলায় বায়োস্কোপ প্রদর্শনের সঠিক তারিখ এখনো জানা যায়নি। উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম বায়োস্কোপ দেখানো হয় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুলাই মুম্বাইয়ের ওয়াটশন হোটেলে।[৪] এ ঘটনার কিছুদিন পরই অর্থাৎ ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে কোলকাতায় বায়োস্কোপ দেখানো হয় বলে বিভিন্ন লেখক-গবেষক উল্লেখ করেছেন। জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায় তার 'চলচ্চিত্রের আবির্ভাব' গ্রন্থে ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাসেই কোলকাতায় বায়োস্কোপ প্রদর্শনের তথ্য দিয়েছেন। মি. হাডসন ও মি. স্টিফেন্স নামে দুজন ইংরেজ প্রাথমিক পর্যায়ে বিভিন্ন হোটেল ও ক্লাবে এ বায়োস্কোপ দেখান বলে লিখেছেন। পরে তারা রঙ্গালয়ে ছবি দেখান।[৫] কিন্তু তিনিও বায়োস্কোপ প্রদর্শনের কোনো নির্দিষ্ট স্থান-তারিখের উল্লেখ করেননি। ফলে অস্পষ্টতা থেকেই যাচ্ছে।

তবে মুম্বাইয়ের বি ঝা 'সিনেমা ভিশন'-এ ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২০ জানুয়ারিতে প্রকাশিত সংবাদের সূত্র ধরে জানিয়েছেন যে, কোলকাতায় ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের নভেম্বর বা ডিসেম্বরে প্রথম বায়োস্কোপ চালু হয়। হাডসন এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন 'থিয়েটার রয়ালে' (সম্ভবত রয়াল বেঙ্গল থিয়েটার)। তবে তিনি এ প্রসঙ্গে আরও জানান যে, হাডসনের আগে স্টিফেন্স বায়োস্কোপ দেখান কোলকাতা হাইকোর্টের কাছে খোলা মাঠে বি ঝা ফাদার ল্যাঁফোর নামও উল্লেখ করেছেন।[৬] গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ উল্লেখ করেছেন যে, স্টিফেন্স স্টার থিয়েটারের সঙ্গে ঢাকা এসেছিলেন। এ প্রসঙ্গে স্টার থিয়েটারের কথা কিছু উল্লেখ করা প্রয়োজন। গিরিশচন্দ্র ঘোষ ১৮৮৩ খ্রিস্টাব্দের ২৮ মার্চ কোলকাতার ৬৮ নম্বর বিডন স্ট্রিটে 'সীতাহরণ' নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে স্টার থিয়েটার চালু করেন ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জুলাই 'বুদ্ধদেব চরিত' ও 'বেল্লিক বাজার' নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে এ প্রতিষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে।[৭] দ্বিতীয় পর্যায়ে অমৃতলাল মিস্ত্রি ও অমৃতলাল বসুর উদ্যোগে স্টার থিয়েটার আবার চালু হয় কোলকাতার ৭৫-৩, কর্নওয়ালিশ স্ট্রিটে ১৮৮৮ খ্রিস্টাব্দের ২৫ মে থেকে নাটক মঞ্চায়নের মাধ্যমে।[৮] এ কোম্পানি ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিলের পর পূর্ববঙ্গ সফরে আসে কয়েক সপ্তাহের জন্য এবং ফিরে যায় ১১ মে।[৯]

এদিকে সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ'-এর ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের ৭ এপ্রিল, ১৪ এপ্রিল ও ১৫ এপ্রিলের সংবাদ থেকে জানা যায় যে, কোলকাতা থেকে আগত স্টার থিয়েটার কোম্পানি আহসান মঞ্জিল, পাটুয়াটুলীস্থ ক্রাউন থিয়েটার ও নারায়ণগঞ্জে 'চন্দ্রশেখর', 'লায়লা মজনু', 'তরুবালা', 'ঋষ্যশৃঙ্গ' ও 'বাবু' নাটক মঞ্চস্থ করে।[১০] 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সূত্র ধরে এ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, স্টার থিয়েটার কোম্পানি এখানে ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে অর্থাৎ কোলকাতায় বায়োস্কোপ প্রদর্শনের এক বছর আগে ঢাকা এসেছিল। এর পরে স্টার থিয়েটার কোম্পানি ১৮৯৬ এবং ১৮৯৭ ও ১৮৯৮ পর্যন্ত কোলকাতাতেই প্রদর্শনী করে মাঝখানে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ২৮ ফেব্রুয়ারি থেকে ১৬ মার্চ পর্যন্ত ত্রিপুরা সফর করে। মাঝখানের সময়টাতে স্টার কোম্পানি ঢাকায়

এসেছিল কিনা তা জানা যায় না। তবে শঙ্কর ভট্টাচার্য পরিবেশিত তথ্য অনুযায়ী স্টার থিয়েটারে প্রথম বায়োস্কোপ দেখানো হয় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ২৯ অক্টোবর।[১৭] শঙ্কর ভট্টাচার্য পরিবেশিত আরেকটি তথ্য অনুযায়ী দেখা যায়, কোলকাতায় প্রথম রঙ্গালয়ে বায়োস্কোপ দেখানো হয় মিনার্ভা থিয়েটারে ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ৩১ জানুয়ারিতে। তখন এর নাম ছিল 'এ্যানিমেটোগ্রাফ'। আর ক্লাসিক থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো হয় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৯ মার্চ 'গোললীলা' নাটকের পরে।[১৮] মুনতাসীর মামুন সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ'-এর সংবাদের সূত্র ধরে জানিয়েছেন যে, ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে বায়োস্কোপ দেখানো হয় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল[১৯] অর্থাৎ কোলকাতার স্টার থিয়েটারেরও আগে। শুধু স্টার নয়, রয়্যাল থিয়েটারের আগেও ঢাকায় বায়োস্কোপ দেখানো হয়। রয়্যালে বায়োস্কোপ দেখানো হয় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ৪ ডিসেম্বর থেকে।[২০] এখন প্রশ্ন হচ্ছে, স্টিফেন্স কি স্টার থিয়েটার কোম্পানির সঙ্গে ঢাকা এসেছিলেন নাকি অন্য কোনো নাট্যদলের সঙ্গে? সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ'-এর ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের ২৪ মে, ৩১ মে ও ২ জুন প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে কোলকাতা থেকে আগত সুদক্ষ অভিনেতা ও অভিনেত্রী, (সুকুমারী দত্ত) অভিনয় করেন।[২১] 'ঢাকা প্রকাশ'-এর ১৮৯৭ খ্রিস্টাব্দের ১৯ ডিসেম্বর প্রকাশিত সংবাদ থেকে জানা যায় যে, মতান্তর হওয়ার কারণে কোলকাতার অভিনেতারা ক্রাউন ছেড়ে চলে গেছেন।[২২]

ঢাকায় ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দের ১৭ এপ্রিল বায়োস্কোপ দেখায় কোলকাতা থেকে আগত ব্রেডফোর্ড সিনেমেটোগ্রাফ কোম্পানি। এ কোম্পানি সম্পর্কে বিস্তারিত কিছু জানা যায় না।

আমরা যদি গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষের তথ্যটি সঠিক বলে ধরি যে, স্টিফেন্স ১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় এসে বায়োস্কোপ দেখিয়ে যান, তাহলে এই ১৯৯৬ খ্রিস্টাব্দেই পূর্ণ হয়েছে ঢাকায় বায়োস্কোপ প্রদর্শনের একশ' বছর। স্টিফেন্স নামটি আমাদের চলচ্চিত্রামোদীদের জন্য আরও গুরুত্বপূর্ণ এ কারণে যে, এ ভদ্রলোকের প্রদর্শিত বায়োস্কোপ (কোলকাতায়) দেখেই প্রথম চলচ্চিত্রের প্রতি আগ্রহী হয়েছিলেন উপমহাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের পথিকৃৎ ঢাকার জিন্দাবাহার লেন তথা মানিকগঞ্জের বকজুরী গ্রামের জমিদার পুত্র হীরালাল সেন (১৮৬৬-১৯১৭)। সেই ইতিহাস আরও গৌরবময়

ক্রাউন থিয়েটারে বায়োস্কোপ প্রদর্শনী

প্যারিসের ক্যাফে থিয়েটার থেকে বোম্বের ওয়াটশন হোটেল, সেখান থেকে কোলকাতার ক্ল্যাসিক এবং স্টার থিয়েটার— ওখান থেকে ঢাকার ক্রাউন থিয়েটার, ভোলার এসডিও-র বাংলো, ভাওয়ালের রাজপ্রাসাদ, মানিকগঞ্জের বকজুরীর মুন্সীবাড়ির নাচঘর, জগন্নাথ কলেজ মিলনায়তন, ফরিদপুরের পালং, আহসান মঞ্জিল, আরমানী টোলার পাটের গুদাম এবং পিকচার হাউজ (শাবিস্তান), লায়ন, পিকচার প্যালেস (রূপমহল), মুকুল ইত্যাদি।

এভাবেই বায়োস্কোপ থেকে টকি, সিনেমা, ফিল্ম, মোশন পিকচার বা আজকের ভাষায় চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হয়েছে বিভিন্ন সময়ে।

ইতোমধ্যে আমরা জেনেছি যে, উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম বায়োস্কোপ প্রদর্শনী হয় বোম্বের ওয়াটসন হোটেলে ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই ফ্রান্সের চিত্র পরিচালক-প্রদর্শক দুভাই লুমিয়ের একজন প্রতিনিধি এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। ওই বছরের নভেম্বর-ডিসেম্বরের মধ্যে কোলকাতায় অনুষ্ঠিত হয় বায়োস্কোপ প্রদর্শনী। ইংরেজ ব্যবসায়ী হ্যাডসন ও স্টিফেন্স এই প্রদর্শনীর আয়োজন করেন বলে জানা যায়। ঢাকা তখন মফস্বল শহর হলেও কোলকাতার কাছাকাছি। অতএব, ওখান থেকে বায়োস্কোপ ঢাকায় আসতে বেশি সময় লাগেনি। ঐতিহাসিক গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ জানিয়েছেন যে, ১৮৯৬-৯৭ সালের মধ্যেই স্টিফেন্স, স্টার থিয়েটারের সঙ্গে ঢাকায় এসে বায়োস্কোপ দেখিয়ে যান। কিন্তু এ সম্পর্কে কোনো সাক্ষ্য-প্রমাণ পাওয়া যায় না। মানিকগঞ্জের হীরালাল সেন ১৮৯৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি কোলকাতায় 'দি রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' গঠন করেন। তিনি মানিকগঞ্জ বা ঢাকায় ওই সময় বায়োস্কোপ প্রদর্শনী করেছিলেন কি না তা জানা যায় না।

গবেষক অধ্যাপক ড. মুনতাসীর মামুন সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকা ঘেঁটে প্রমাণ করেন যে, ঢাকায় ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল সদরঘাট পটুয়াটুলী এলাকার ক্রাউন থিয়েটারে (বর্তমানে অবলুপ্ত) প্রথম বায়োস্কোপ দেখানো হয়। জানা মতে, এটিই বাংলাদেশে প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। ওই তারিখের পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদটি ছিল :

'অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটারে অদ্য রাত্রি হইতে অদ্ভুত দৃশ্য প্রদর্শিত হইবে। এরূপ সজীব চিত্র প্রদর্শন করিবেন যাহা দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময় জন্মিবার সম্ভাবনা। গত বছর গ্রিক ও তুরস্কে যে ভীষণ যুদ্ধ হইয়াছে তাহাও অন্যবিধ আশ্চর্য বিষয় যেন ঠিক কার্যক্ষেত্রে যাইয়া প্রত্যক্ষ করিতেছি বলিয়া নাকি বোধ হইবে।'[১৭]

'ঢাকা প্রকাশ'-এর পরবর্তী সংখ্যায় অর্থাৎ ১৮৯৮ সালের ২৪ এপ্রিল ওই বায়োস্কোপ প্রদর্শনের বিস্তারিত বিবরণ প্রকাশিত হয় 'সিনেমেটোগ্রাফ' বা 'জীবন্ত দৃশ্য' শিরোনামে। এ বিবরণটিকে বাংলাদেশের প্রথম চলচ্চিত্র আলোচনা বা সমালোচনাও বলা যেতে পারে। ক্রাউন থিয়েটারে প্রদর্শিত বায়োস্কোপ ছিল বিভিন্ন খণ্ডচিত্র বা দৃশ্যের সমাহার। প্রদর্শিত চিত্রের মধ্যে ছিল :

১. মহারানী ভিক্টোরিয়ার উৎসব মিছিল।
২. গ্রিক-তুরস্ক যুদ্ধে তুর্কি সেনাদের নির্যাতন, গ্রিক নৌবাহিনীর তুর্কি দুর্গ অবরোধ ও গুপ্তচর হত্যা
৩. কুমারী ডিয়নের ৩০০ ফুট উঁচু থেকে লাফ।
৪. রুশ জার সম্রাটের অভিষেক।
৫. পাগল নাপিতের বিচিত্র ক্ষৌরকর্ম
৬. সমুদ্রে তুফান।

৭. সিংহের সঙ্গে পালকের খেলা

৮. ফ্রান্সের রাস্তায় জনসমাগম, ফরাসি সৈনিকদের ঘোড়ায় চড়া, ফ্রান্স রেলে যাতায়াত।

৯. ইংল্যান্ডের রাস্তায় তুষারপাতে কৌতুক-ক্রীড়া ইত্যাদি।

এ প্রদর্শনীতে টিকিটের হার ছিল আট আনা থেকে তিন টাকা

নিচে বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর পূর্ণ বিবরণ দেয়া হলো :

সিনেমাটোগ্রাফ বা জীবন্ত দৃশ্য

ফটোগ্রাফ ও ছায়াবাজি সকল পাঠকেই ভালো দেখিয়াছেন। ফটোগ্রাফে লোকের নিশ্চল ছবি পরিলক্ষিত হয়, ছায়াবাজিতে ছবিগুলিকে একটু নাড়িয়া চাড়িয়া দেখান হয়, কিন্তু সে নাড়িয়া চাড়িয়া দেখানে একটু বাহাদুরী থাকিলেও ঠিক জীবিত লোকের কার্যবৎ পরিলক্ষিত হয় না। ঐ সিনেমাটোগ্রাফে যে দৃশ্য পরিলক্ষিত হয়, তাহা অতি আশ্চর্য। অত্রত্য ক্রাউন থিয়েটার গৃহে কলিকাতা হইতে যে একটি কোম্পানি আসিয়া ঐ সিনেমাটোগ্রাফ প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহার একটি বিষয় আমরা সংক্ষেপে পাঠককে বলিলেই পাঠক বুঝিবেন, কি আশ্চর্য ব্যাপার। আমরা দেখিয়াছি, শ্রী শ্রীমতি ভারতেশ্বরীর ডায়মন্ড জুবিলির মিছিল, গ্রিক-তুরস্ক যুদ্ধে তুরস্কের মুসলমান সৈন্য কর্তৃক গ্রিকদিগের স্ত্রী-পুরুষের লাঞ্ছনা ও হত্যা, গ্রিকের যুদ্ধে জাহাজ কর্তৃক তুরস্কের প্রভীষা দুর্গ অবরোধ, গ্রিকের গুপ্তচরকে ধরিয়া হত্যা করা, কুমারী ডিয়নের ৩০০ ফুট উচ্চ হইতে জলে পতন, রুশ জারের অভিষেক উপলক্ষে জনতা, পাগল নাপিতের ভয়াবহ ক্ষৌরকর্ম, সমুদ্রে তুফান, সিংহসহ পালকের ক্রীড়া, ফ্রান্সের বড় রাস্তায় লোকদিগের গমনাগমন, ফরাসি সৈন্যের অশ্বারোহণ-এ গমনাগমন, ফ্রান্সের রেলে লোকের যাতায়াত এবং আরও অনেক প্রকার দেখিবার যোগ্য দৃশ্য।

মহারানীর জুবিলি মিছিলে দেখিবে, সৈন্যগণ ও ইংল্যান্ডের বড় লোকের ঘোড়া ও গাড়ি আরোহণে হাজারে হাজারে ক্রমশঃ চলিয়া যাইতেছেন, ইহারই মধ্যে মহারানী একখানি গাড়ির শোভা বিস্তার করিয়া চলিয়া গেলেন প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঘোটকগুলি আরোহীসহ কখনও কখনও নাচিতে নাচিতে, কখনও হাঁটিয়া, কখনও দৌড়াইয়া চলিতেছে, কখনও মিছিলের গতিরোধ হওয়ায় থামিতেছে— যেন প্রকৃতপক্ষেই মিছিল দেখিতেছি বলিয়া বোধ হইতেছে। তুর্কি মুসলমান সৈন্যরা কয়েকজন একটা প্রকাণ্ড বাড়ির সম্মুখে আসিল, বাড়ির দরজা রুদ্ধ দেখিয়া বড় বড় মুগুর প্রহারে দরজা ভাঙ্গিয়া ফেলিল, গৃহে প্রবেশপূর্বক খুঁজিতে লাগিল। পুরুষ পাইলে তাহাকে ধরিয়া আনিয়া প্রহার করতঃ মারিয়া ফেলিল। আবার কোনো সৈন্য একটি রমণীকে ধরিয়া নির্জনে লইয়া গেল, কেহ কেহ ঘরের সিন্দুক বাক্সাদি বাহির করিতে লাগিল, বিভিন্ন ব্যক্তি বিভিন্ন রূপে ভয়ানক কার্যকলাপ করিতে লাগিল। গ্রিকের এই প্রকাণ্ড যুদ্ধজাহাজ এক স্থানে লাগিয়াছে, ঐ জাহাজ ভিন্ন তুরস্কের প্রভীষা দুর্গ দেখা যায় না বটে, কিন্তু তাহারই

উদ্দেশ্যে জাহাজের মধ্য হইতে কয়েকজন গোলন্দাজ সৈন্য বাহির হইয়া কামানে আগুন দিতে লাগিল: কামানের শব্দ নাই কিন্তু ধূমে জাহাজটি ঢাকিয়া গেল, আবার পরিষ্কার হইল, কামান দাগা হইল: ও ধূমাচ্ছন্ন হইল। ইহারই মধ্যে ঐ গোলন্দাজদিগের একজন ছটফট করিতে করিতে মৃত্যুলাভ করিল: অর্থাৎ অবরুদ্ধ প্রভীষা নগর হইতে কামানের গোলা ভাসিয়া তাহার নিপাত করিল বলিয়াই বোধ হইল।

তুরস্কের সৈন্যরা গ্রিকের তুর্নাভাস নামক অতি সুন্দর একটি দুর্গ আক্রমণ করিল। গ্রিকেরা পলাইয়া দুর্গে প্রবেশপূর্বক দরজা বন্ধ করিল তুরস্কের সেনারা কয়েকজন আসিয়া দেখে, দরজা বন্ধ। তখন তাহাদের একজন দুর্গের ভিত্তিতে কোনো একটা কাজ করিল, অমনই ধূমরাশি উদগীরণ হইয়া দরজা ভাঙ্গিয়া গেল, তখন তুরস্ক সেনারা ঐ ভগ্ন দরজা দিয়া প্রবেশ করিতে লাগিল: কামান, বন্দুকের ধূম উদগীরিত হইতে লাগিল, কোনো কোনো সৈন্য ভূমিতে গড়িয়া ছটফট করিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল একজন ভদ্রলোক টেবিল সম্মুখে বসিয়া বোধহয় বিচার করিতেছেন। কয়েকজন তুর্কি সৈন্য একজন গ্রিক গুপ্তচরকে ধরিয়া আনিল, তার পকেটে বোধহয় একটা কিছু পাওয়া গেল, ইহারই মধ্যে বিচার হইল, তাহাকে বান্ধিয়া এক স্থানে রাখা হইল, কতকগুলি সৈন্য বন্দুকসহ সারিবন্দি হইয়া হাঁটু গাড়িয়া বসিল, তাহাদের সকলের বন্দুক হইতে একবারে সহস্র ধূমরাশি নির্গত হইল, সেই গুপ্তচরটার প্রাণ তৎসঙ্গে উড়িয়া গেল। আর একটা গ্রিক দুর্গের দরজা তুর্কি সৈন্যরা ভাঙ্গিয়া ফেলিলেও তাহার মধ্য হইতে ধূমরাশি নির্গত হইয়া তৎসঙ্গে অবশ্যই কামানের গোলায় অনেক তুর্কি সেনার পতন হওয়ায় তাহারা প্রত্যাবর্তন করিল

ইংল্যান্ডের একটা বড় রাস্তায় তুষারপাত হইয়াছে। তাহার উপর শত শত সাহেব ও বিবি দৌড়াদৌড়ি হুড়াহুড়ি করিয়া পরস্পর পরস্পরকে বরফ তুলিয়া তুলিয়া ছুঁড়িয়া মারিতেছে, ঐ নিক্ষিপ্ত বরফ অনেকের কাল পরিচ্ছদের উপরে সাদা হইয়া উঠিয়াছে, নিক্ষিপ্ত তুষারের কতক কতক ঝরঝর করিয়া পড়িয়া পড়িয়া যাইতেছে: ইহারই মধ্যে কেহ বাইসাইকেল হইতে পড়িলেন, হাঁটু ভাঙ্গিয়া কষ্টে-সৃষ্টে পতিত বাইসাইকেল লইয়া চলিয়া গেলেন। পাগলা নাপিতের ক্ষৌরকার্যটি এক ভয়ানক ভোজবাজি। একটি সাহেব ক্ষৌরির নিমিত্তে চেয়ারে বসিয়াছেন, নাপিত প্রথমে গিয়া তাহার দাড়ি-গোঁফ খুব ভালো করিয়া ভিজাইয়া আনিল। পরে খুব ধারাল ক্ষুর ও কাইচি আরও শানাইয়া লইল। তাহার চেষ্টা দেখিয়া ভদ্রলোক উঠিবার চেষ্টা করিলেও সে থামাইয়া প্রথমে ক্ষৌরির আয়োজন করিল এবং ক্ষুর গলায় বসাইয়া গলা একেবারে কাটিয়া মাথাটি লইয়া আসিল। পরে ঐ মাথাটির দাড়ি-গোঁফ যেভাবে ক্ষৌর করিতে হয় করিয়া তাহার গলায় কি একটা জিনিস মাখাইল এবং মাথাটি দেহের যথাস্থানে লাগাইবা মাত্র ভদ্রলোকটি বাঁচিয়া উঠিলেন। তিনি তখন সেই দুরন্ত নাপিতকে ধরিয়া তাহার বৃহৎ গামলার মধ্যে ফেলিয়া পাড়াইতে লাগিলেন বোধহয়, যেন নাপিত সেই গামলার মধ্যে নিস্পিষ্ট হইয়া মরিল, কিন্তু পরে সেই গামলা ভদ্রলোক উল্টাইয়া দেখাইলেন তাহার মধ্যে কিছুই নাই। এই ভয়ানক

ভোজবাজি বস্তুতই বিস্ময়জনক। একটা জলাশয়ের উপরে একটা বাড়ি ও ঘটনা। বাড়ির বহু উচ্চ ছাদ ও নানা স্থান হইতে শত শত সাহেব লাফাইয়া লাফাইয়া ঐ জলে পড়িতেছেন, তাহাদের পতনের সঙ্গে সঙ্গে জল ছিটিয়া দশ বার হাত উচ্চে উঠিতেছে, তাহারা সাঁতরাইয়া আবার উঠিতেছেন, আবার পড়িতেছেন। এইরূপ বহু প্রকার কার্য ঠিক যেন জীবিত লোকে করিতেছে বলিয়া উল্লিখিত সিনেমাটোগ্রাফে পরিলক্ষিত হইতেছে। এই সিনেমাটোগ্রাফ যিনি উদ্ভাবন করিয়াছেন, তাহার বিজ্ঞত্ব অসাধারণ তাহার উদ্ভাবিত যন্ত্রের ব্যবহারকারীরাও ধন্যবাদভাজন। এই আশ্চর্য দেখিবার নিমিত্ত অর্থ ব্যয় করাকে আমরা সার্থক মনে করি জীবিত লোককৃত নাটক সার্কাসাদি অপেক্ষা ইহা শত সহস্র গুণ শ্লাঘ্য তাহা আমরা না বলিয়া পারি না ইহা দেখাও খুব বেশি ব্যয়সাধ্য নহে— শ্রেণীভেদে আট আনা হইতে তিন টাকা মাত্র। অতএব এই আশ্চর্য ব্যাপার সকলেরই দেখিয়া রাখা উচিৎ।[১৮]

এই বায়োস্কোপ প্রদর্শনের বিষয়টি বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাসে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা। সেইসঙ্গে ইতিহাসে ঠাঁই পেয়েছে ক্রাউন থিয়েটার— যেখানে প্রদর্শিত হয়েছিল প্রথম বায়োস্কোপ। কিন্তু সেই ক্রাউন থিয়েটারের কথা 'কেউ জানে কেউ জানে না'। কালের আবর্তে বিলুপ্ত হয়ে গেছে একদার উজ্জ্বল সেই নাট্যালয়

ক্রাউন থিয়েটারের আগেও ঢাকায় কয়েকটি নাট্যালয় ছিল। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ছিল 'পূর্ববঙ্গ রঙ্গভূমি' (১৮৬৩), ঢাকা বিশেষজ্ঞ ড. মুনতাসীর মামুনের মতে, ক্রাউন থিয়েটারের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৯০-৯২ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে[১৯] দক্ষিণ মৈশুণ্ডিতে 'সনাতন নাট্যসমাজ' নামে একটি গোষ্ঠী ছিল এটি ভেঙে গেলে এর সঙ্গে জড়িতরাই ক্রাউন থিয়েটার প্রতিষ্ঠা করে। উদ্যোক্তাদের মধ্যে ছিলেন আনন্দমোহন সাহা, মনিমোহন সাহা, রাখালচন্দ্র বসাক, হরিদাস বসাক প্রমুখ।[২০]

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ক্রাউন থিয়েটার ছিল সরব ঢাকার মির্জা আব্দুর কাদের সর্দারের লায়ন থিয়েটারের প্রাধান্য, নিয়মিত সিনেমা চালুর ফলে ক্রাউন থিয়েটার বিলুপ্ত হয়ে যায় বিশ শতকের বিশের দশকে এই মঞ্চের সঙ্গে জড়িত ছিল নাট্যগোষ্ঠী। এরা প্রথমে মঞ্চে 'দুনিয়া নামে' স্থানীয় অভিনেত্রী আনে।[২১]

১৮৯৩-এর দিকে এখানে প্রতি সোম, দু'দিন শনি ও বুধবারে প্রদর্শনী হতো। টিকিটের হার ছিল প্রথম শ্রেণী (গদি) দুই টাকা, দ্বিতীয় শ্রেণী (চেয়ার) এক টাকা, তৃতীয় শ্রেণী (টুল) আট আনা এবং চতুর্থ শ্রেণী (গ্যালারি) চার আনা।[২২]

১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে এখানে মনিপুরী রাজবংশের মেয়েরা 'রাসলীলা' মঞ্চস্থ করে। এদের বয়স ছিল ১২ থেকে ১৯ বছরের মধ্যে। ওই সনের মে মাসে এখানে মঞ্চস্থ হয় 'চৈতন্যলীলা' ও 'পূর্ণচন্দ্র'। ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে মঞ্চস্থ হয় 'মীরাবাঈ' ও 'রাজা বাহাদুর'। এরপর নাট্যালয়টি কিছুদিন বন্ধ থাকে।[২৩]

১৮৯৬ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে এখানে 'আবু হোসেন' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এতে অংশ নেয় কোলকাতা থেকে আনা অভিনেতা-অভিনেত্রীগণ। অস্থানীয় শিল্পীদের অভিনয়

বিভিন্ন মহলে অভিনন্দিত হয়। এপ্রিল (১৮৯৬) মাসে এখানে মঞ্চস্থ হয় বঙ্কিমচন্দ্রের 'কপালকুণ্ডলা'। 'ঢাকা প্রকাশ'-এর ২ জুন, ১৮৯৮ তারিখের সংবাদ থেকে জানা যায়, ক্রাউন থিয়েটারে অংশ নেয়া কোলকাতার বিখ্যাত অভিনেত্রী সুকুমারী দত্তের নাম পত্রিকায় লেখা হয় : 'সুকুমারী দত্তকে অদ্যত্য ক্রাউন থিয়েটারে আনা হইয়াছে শ্রীমতীর অভিনয় দেখিয়া ও গান শুনিয়া লোকে ধন্য করিতেছে।'[১৭]

১৮৯৯ খ্রিস্টাব্দের জানুয়ারি মাসে ক্রাউন থিয়েটারে একটি দুর্ঘটনা ঘটে। স্ত্রীলোক নিয়ে ঘটনার জের হিসেবে পুলিশ একজন ছাত্রের মাথা ফাটিয়ে দেয় বলে জানা যায়। পরে পুলিশ মামলাও রুজু করে। বিচারে মামলা ডিসমিস হয়ে যায়। এ বছরের জুন মাসে ক্রাউন থিয়েটারে এসে যোগ দেন কোলকাতার বিখ্যাত অভিনেতা অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী। সেপ্টেম্বর মাসে এখানে মঞ্চস্থ 'প্রফুল্ল' নাটকটি প্রশংসিত হয়[১৮] ১৯২০-২৩ সালে ক্রাউন থিয়েটারের শিল্পী ছিলেন মহর্ষী মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যও।[১৯]

ক্রাউন থিয়েটার ঢাকা তথা উপমহাদেশের অনেক শিল্পীর অভিনয়ে সমৃদ্ধ ছিল এদের মধ্যে দুনিয়া, ললিতচন্দ্র দাস, হরিপদ দে, বিনু বাবু, বিনোদ বাবু, নুটু রায়, রাধামাধব চক্রবর্তী, গৌরচন্দ্র দাস, বর্ধমানের রানী, কনক সরোজিনী, সরলা, অর্ধেন্দু শেখর মুস্তফী, সুকুমারী দত্ত, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, ধীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সতীশচন্দ্র ভট্টাচার্য, অনাথ বন্ধু বন্দ্যোপাধ্যায়, পান্নাদাসী, করুণা প্রমুখ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু সেই ইতিহাস ঢাকা পড়ে গেছে। দেশে নাট্যচর্চার ইতিহাস ঐতিহ্য নিয়ে গবেষণা হচ্ছে, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে হচ্ছে পিএইচডি থিসিসও কিন্তু সেই গবেষণায় পুরনো ঢাকার নাট্যচর্চা, নাট্যগোষ্ঠী ও নাট্যগৃহ সম্পর্কে বিস্তারিত তথ্য ও ইতিহাস থাকছে না। নাট্যগবেষক-নাট্যমোদীরা এ ব্যাপারে আগ্রহী হলে ভালো হয়।

জগন্নাথ কলেজে বায়োস্কোপ প্রদর্শনী

১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল ক্রাউন থিয়েটারে বায়োস্কোপ প্রদর্শনীর পর ঢাকায় আরেকটি প্রদর্শনীর খবর পাওয়া যায় জগন্নাথ কলেজে ১৯০২ সালের ১২ মে সোমবার রাত ৯টায় এই প্রদর্শনি অনুষ্ঠিত হয়। এ সম্পর্কিত একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয় সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' পত্রিকার ১৯০২ সালের ১১ মে সংখ্যায় বিজ্ঞাপনটি ছিল :

অভিনব অভাবনীয় ব্যাপার!

১২ই মে, ২৯শে বৈশাখ, সোমবার রাত্রি নয় ঘটিকার সময়!

এইখানে এই নতুন! এইখানে এই নতুন!! জগন্নাথ কলেজ গৃহে বায়োস্কোপ

জীবন্ত চিত্র! জীবন্ত চিত্র!! জীবন্ত চিত্র!!!

পাশ্চাত্য জগতের শিক্ষিত হস্তে পরিচালিত।

প্রবেশ মূল্য ঃ

প্রথম শ্রেণী ১ টাকা

দ্বিতীয় শ্রেণী ৮ আনা

তৃতীয় শ্রেণী ৪ আনা
চতুর্থ শ্রেণী ৩ আনা
স্ত্রীলোকের গ্যালারি টিকিট আট আনা দেখিয়া যাইবেন, নচেৎ অক্ষেপ করিবেন।"

আহসান মঞ্জিলে রয়্যাল বায়োস্কোপের প্রদর্শনী

চলচ্চিত্র আবিষ্কারের প্রথম যুগে সচল ছবি প্রদর্শনের যন্ত্রকে বলা হতো 'কিনেটোস্কোপ' বা 'বায়োস্কোপ'। এই বায়োস্কোপ কথাটিই পরে চালু হয়। 'বায়োস্কোপ' পরে 'মোশন পিকচার' বা চলচ্চিত্র বলে আখ্যায়িত হয়।

বায়োস্কোপের প্রতি প্রবল আগ্রহ জন্মে বাংলাদেশের মানিকগঞ্জের তরুণ ছাত্র হীরালাল সেনেরও। তিনি তখন আইএসসি'র ছাত্র। হীরালাল যোগাযোগ করেন স্টিফেন্সের সঙ্গে। কিন্তু ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কারণে তিনি হীরালালকে সহায়তা করেননি। হীরালাল পরে যোগাযোগ করেন ফাদার ল্যাঁফোর সঙ্গে ফাদার ল্যাঁফো বায়োস্কোপের ব্যাপারে তাকে নানাভাবে সহায়তা করেন। ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল হীরালাল প্রতিষ্ঠা করেন 'রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি'। তিনি বিদেশ থেকে ছবি আমদানি করে পূর্ব-ভারতের সেকালের রাজা, মহারাজা, জমিদার ও পদস্থ সরকারি কর্মকর্তাদের অনুষ্ঠান বা বাংলোতে বায়োস্কোপ দেখাতে শুরু করেন। 'দি রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি' ১৮৯৮ সালে ভোলার এসডিও'র বাংলোতে ছবি প্রদর্শন করে প্রায় সপ্তাহ ধরে ১৯০০ সালের ১৫ এপ্রিল এই কোম্পানি ভাওয়ালের রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ রায়ের বাড়িতেও ছবি দেখায়।"

হীরালাল সেন তার গ্রামের বাড়ি বকজুরিতেও চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন ১৯০২ থেকে ১৯০৫ সালের মধ্যে ওই প্রদর্শনী হয় তার বাড়ির নাট-মন্দিরে। এই নাট-মন্দির বানিয়েছিলেন গোকুল কৃষ্ণ মুনশী। সেকালে বাংলাদেশে এত বড় নাট্যশালা আর ছিল না। হীরালাল সেনের আত্মীয় শিশির কুমার গুপ্ত ৫/৬ বছর বয়সে মায়ের আঁচল ধরে ওই নাট্যশালায় বায়োস্কোপ দেখেছেন বলে জানান।"

হীরালাল সেনের বায়োস্কোপ কোম্পানি ১৯১১ খ্রিস্টাব্দের মার্চ মাসে আহসান মঞ্জিলে তিন দিনব্যাপী বায়োস্কোপ দেখায় বলে নওয়াব পরিবারের খাজা শামসুল হকের ডায়েরি থেকে জানা যায়। এ সম্পর্কে একটি নিবন্ধ প্রকাশিত হয় দৈনিক বাংলায় ১৯৯৫ সালের ২০ ডিসেম্বর সংখ্যায়।"

১৯১১ সালের ২২ মার্চ রাতে ঢাকার নওয়াব বাড়ির আহসান মঞ্জিল প্রাসাদে বায়োস্কোপ দেখানো হয়। খাজা শামসুল হকের ডায়েরি থেকে জানা যায়, এ তারিখে নওয়াব খাজা সলিমুল্লাহ ঢাকার গণ্যমান্য হিন্দু ও মুসলমানদেরকে আহসান মঞ্জিলে আমন্ত্রণ করেন আনন্দ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য।

এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল নওয়াব সলিমুল্লাহের আত্মীয় খাজা ইউসুফজাইয়ের 'নওয়াব বাহাদুর' খেতাবপ্রাপ্তি উপলক্ষে। ব্রিটিশ সরকার খাজা

ইউসুফজানকে ১৯১১ সালের ১৬ মার্চ এই খেতাব দেন এর আগে তিনি ১৯১০ সালের ১০ জুন 'নওয়াব' খেতাব পান। তার নওয়াব বাহাদুর খেতাবপ্রাপ্তি উপলক্ষে তৎকালীন গভর্নর হাউজে (পুরনো হাইকোর্ট ভবন) দরবার অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। রাতে শহরে আলোকসজ্জা করা হয়। নওয়াব সলিমুল্লাহও আহসান মঞ্জিলে সংবর্ধনা দেন তাকে।

খাজা ইউসুফজানের 'নওয়াব বাহাদুর' খেতাবপ্রাপ্তি উপলক্ষে ২২ মার্চ ভিক্টোরিয়া পার্কেও সংবর্ধনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। এতে অন্যান্যের মধ্যে পূর্ববঙ্গ ও আসাম প্রদেশের লে. গভর্নর উপস্থিত ছিলেন। পরে সন্ধ্যা থেকে রাত সাড়ে নটা পর্যন্ত নওয়াব বাড়ির কুঠিতে রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি ছবি প্রদর্শন করে। নওয়াবজাদী আমেনা বানু এই প্রদর্শনীর খরচ বহন করেন। নওয়াব বাড়ির প্রায় সবাই এই বায়োস্কোপ উপভোগ করেন।

১৯১১ সালের ২৪ মার্চ রাতে সেকালের প্রখ্যাত কংগ্রেস নেতা নওয়াব পরিবারের খাজা আবদুল আলীমের বাসায়ও (বর্তমানে ১৬/১ আহসান মঞ্জিল এলাকা) বায়োস্কোপ দেখানো হয়। এই প্রদর্শনীতে পরিবারের নারী-পুরুষ-শিশু সবাই উপস্থিত ছিল।

বায়োস্কোপ প্রদর্শনের আরও একটি খবর পাওয়া যায় খাজা শামসুল হকের ডায়েরিতে ১৯১১ সালের ২৫ মার্চ রাতে এ বায়োস্কোপ দেখানো হয় খাজা আজিজুল্লাহর বাসায়। তিনি নওয়াব পরিবারের কাউকে এই প্রদর্শনীতে দাওয়াত দেননি। খাজা পরিবারের লোকদের মধ্যে যে নানা দ্বন্দ্ব ও শীতল সম্পর্ক বিরাজ করছিল সম্ভবত এ কারণেই তিনি আলাদাভাবে এ প্রদর্শনীর আয়োজন করেন। তিনি তখন অন্য এলাকায় থাকতেন।[৩]

উল্লেখ্য, নওয়াব আহসানুল্লাহর আমন্ত্রণে ১৮৯৮ সালের এপ্রিলেও বায়োস্কোপ দেখানো হয়।

এখানে রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানির প্রতিষ্ঠাতা হীরালাল সেন সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা যেতে পারে।

অবিভক্ত বাংলা তথা সার ভারত উপমহাদেশের চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও নির্মাণ করে পথিকৃৎ হয়ে আছেন ঢাকার জিন্দাবাহার লেন তথা মানিকগঞ্জের বকজুরি গ্রামের হীরালাল সেন তার কথা আগেও কিছু বলা হয়েছে। চলচ্চিত্র শিল্পের এই জনক সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে জানা যায় কালীশ মুখোপাধ্যায়, দীনেশচন্দ্র সেন ও গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষের লেখা থেকে।[৪]

হীরালাল সেনের জন্ম ১৮৬৬ সালে মানিকগঞ্জের বকজুরি গ্রামে বৈদ্য বংশে তার প্রাথমিক লেখাপড়া শুরু হয় মানিকগঞ্জ ও ঢাকায়। তার পিতা চন্দ্রমোহন সেন ছিলেন প্রথমে ঢাকা জেলা কোর্ট ও পরে কোলকাতা হাইকোর্টের একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। কোলকাতায় চন্দ্রমোহনের বাসা ছিল ৮৫/২, মসজিদ বাড়ী স্ট্রিটে। হীরালালের বংশ মানিকগঞ্জ এলাকায় পরিচিত মুনশী বংশ নামেও। এই বংশের পূর্বপুরুষ রঙ্গারাম সেন

মুন্শী ছিলেন মুসলিম আমলে একজন কর্মচারী। বাঞ্ছারামের দুই পুত্র শ্রীকণ্ঠ সেন ও উগ্রকণ্ঠ সেন। শ্রীকণ্ঠের পুত্রের নাম গোকুল কৃষ্ণ সেন মুন্শী। তিনি ছিলেন সেকালের ঢাকার একজন বিশিষ্ট আইনজীবী। তার বাসা ছিল জিন্দাবাহারে। গোকুল কৃষ্ণ মুন্শীর ছেলের নাম চন্দ্রমোহন সেন ও শ্রীমোহন সেন। চন্দ্রমোহনের আইন ব্যবসা ও জমিদারীর আয় কমে গেলে তিনি কোলকাতায় চলে যান। হীরালাল সেনের মায়ের নাম ছিল বিধুমুখী আর নানা শ্যামচাঁদ ছিলেন দিনাজপুর কালেক্টরেটের সেরেস্তাদার। শ্যামচাঁদ ছিলেন একজন কবি ও গীতিকার। তিনি সেকালে অনেক সারিগান ও পদ রচনা করেছিলেন।

আইনজীবী পরিবারের সন্তান হীরালালের আকর্ষণ ছিল বিজ্ঞান, বিশেষ করে আলোকচিত্রের প্রতি।

এ ব্যাপারে তার উপর প্রভাব পড়েছিল ফুফাতো ভাই সাহিত্যিক গবেষক দীনেশচন্দ্র সেনের। বয়সে দু'বছরের বড় দীনেশচন্দ্র মামাতো ভাই হীরালালকে নিয়ে বকজুরি গ্রামে বিভিন্ন ছবি আঁকতেন, লণ্ঠনের সাহায্যে কাপড়ের মধ্যে ছায়াবাজি দেখাতেন।

ছাত্রাবস্থায়ই হীরালাল ক্যামেরা যোগাড় করে ফটোগ্রাফি চর্চা শুরু করেন। ১৮৯০ সালের দিকে তিনি কোলকাতায় 'এইচএল সেন অ্যান্ড ব্রাদার্স' নামে একটি ফটোগ্রাফিক স্টুডিও খুলেন। অতি অল্প সময়ের মধ্যেই একজন সুদক্ষ আলোকচিত্রী হিসেবে তার সুনাম ছড়িয়ে পড়ে। হীরালাল সেন যখন ফটোগ্রাফি চর্চায় ব্যস্ত তখন বিজ্ঞানের নব আবিষ্কার চলচ্চিত্রের প্রদর্শনী হচ্ছে বিভিন্ন দেশে। তিনি বিভিন্ন সূত্র থেকে অবগত হয়ে এ ব্যাপারে ক্রমেই আগ্রহী হয়ে ওঠেন। ১৮৯৬ সালের জুলাই মাসে বোম্বের ওয়াটশন হোটেলে অনুষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম বায়োস্কোপ বা চলচ্চিত্র প্রদর্শনী। এর কিছুদিন পর কোলকাতায়ও বায়োস্কোপ প্রদর্শিত হয়। এ বায়োস্কোপ প্রদর্শনের নেতৃত্ব দেন দুজন বিদেশী। একজন ব্যবসায়ী স্টিফেন্স আরেক জন সেন্ট জ্যাভিয়ার্স কলেজের অধ্যাপক ফাদার ল্যাঁফো। স্টিফেন্স বায়োস্কোপ দেখান কোলকাতার হাতিবাগানের কাছে স্টার থিয়েটার সর্বসাধারণ্যে আর ফাদার ল্যাঁফো বায়োস্কোপ দেখান ছাত্রদের। হীরালাল সেন ও তার ছোটভাই মতিলাল সেন স্টার থিয়েটারে প্রদর্শিত বায়োস্কোপ দেখেন। পরে হীরালাল স্টিফেন্সের সঙ্গে যোগাযোগ করেন এ ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে। কিন্তু ব্যবসায়িক প্রতিদ্বন্দ্বিতার কথা ভেবে বিদেশী স্টিফেন্স বাঙালি হীরালালকে অনেকদিন পর্যন্ত ঘুরিয়ে শেষ পর্যন্ত 'বায়োস্কোপ'-এর গোপন রহস্য উন্মোচন করেননি। উদ্যমী হীরালাল পরে নিজেই পত্রপত্রিকা পড়ে বায়োস্কোপ রহস্য অবগত হয়ে মা-র কাছ থেকে পাঁচ হাজার টাকা নিয়ে বিদেশ হতে যন্ত্রপাতি আনেন। বিদ্যুতের অভাব ছিল তখন। হীরালাল সেন রাবারের ব্যাগভর্তি অক্সিজেন গ্যাসের সাহায্যে লাইম লাইটের ব্যবস্থা করে বায়োস্কোপ দেখাতে শুরু করেন। এভাবে কিছুদিন প্রদর্শনের পর সেই রাবারের ব্যাগ ফেটে গেলে প্রতিকারের জন্য হীরালাল ছুটে যান অধ্যাপক ফাদার ল্যাফোর কাছে।

ফাদার ল্যাঁফোর সেই ব্যাগ সরিয়ে দেন। হীরালাল পরে রবারের ব্যাগের পরিবর্তে ট্যাংক ব্যবহার শুরু করেন

বায়োস্কোপ প্রদর্শনের জন্য হীরালাল সেন ১৮৯৮ সালে গঠন করেন 'দি রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি'। তার সঙ্গে ছিলেন ছোটভাই মতিলাল সেন ও দেবকীলাল সেন এবং ভাগ্নে কুমার শংকর গুপ্ত (ভেলানাথ)। ১৮৯৮ সালের ৪ এপ্রিল এই কোম্পানি প্রথম চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর আয়োজন করে। হীরালাল সেন পরে চলচ্চিত্র নির্মাণ ও প্রেক্ষাগৃহ প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯০০ সালে তিনি ইংল্যান্ড থেকে ছবি তোলার যন্ত্রপাতি আনেন। এই উদ্দেশ্যে তিনি যোগাযোগ করেন স্টারের সুদক্ষ ম্যানেজার অমরেন্দ্রনাথ দত্তের সঙ্গে। অমর দত্ত তখন কোলকাতার ক্লাসিক থিয়েটারের মালিক। ওখানে তখন মঞ্চস্থ হচ্ছিল জনপ্রিয় নাটক 'সীতারাম'। হীরালাল সেন ওই নাটকের নির্বাচিত খণ্ডদৃশ্য চলচ্চিত্রায়িত করেন। এরপর অনেক নাট্যদৃশ্য তিনি ক্যামেরায় ধরে রাখেন। হীরালাল সেন এভাবেই প্রথম বাঙালি চলচ্চিত্র প্রদর্শক ও নির্মাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন। তিনি এই উপমহাদেশের প্রথম তথ্যচিত্র এবং বিজ্ঞাপনচিত্র নির্মাতাও। ১৯০০ থেকে ১৯১২ সালের মধ্যে তিনি অনেক নাট্যচিত্র (খণ্ড), তথ্যচিত্র ও ৩টি বিজ্ঞাপনচিত্র তৈরি করেন। এসব ছবির দৈর্ঘ্য ছিল ৫০ থেকে ২৫০ ফুটের মধ্যে।

তার নির্মিত ছবির মধ্যে ছিল 'সীতারাম', 'আলীবাবা', 'সরলা', 'ভ্রমর', 'হরিরাজ', 'দোললীলা', 'বুদ্ধ' প্রভৃতি। এগুলো ক্লাসিক থিয়েটার মঞ্চে ১৯০০-১৯০১ সালের মধ্যে চিত্রায়িত হয়। তথ্যচিত্র : চিৎপুর রোডের মানুষ ও যানবাহন, দিল্লিতে সম্রাট পঞ্চম জর্জের অভিষেক (১৯১১), পুকুরে স্নানরত গ্রামবাসী প্রভৃতি। বিজ্ঞাপনচিত্র : এডওয়ার্ডস এন্টি ম্যালেরিয়া স্পেসিফিক কোম্পানির পেটেন্ট ওষুধ (বটকৃষ্ণ পাল অ্যান্ড কোং), জবাকুসুম তেল (সি.কে. সেন অ্যান্ড কোং) ও সালাসাপিলা (ডবলিউ বেজর অ্যান্ড কোং)।

চলচ্চিত্র প্রদর্শক ও নির্মাতা হিসেবে হীরালাল সেন শুধু নিজেই অগ্রপথিক ছিলেন না। এই মাধ্যমে তিনি আরো অনেককে এনেছেন প্রথম। তার চিত্রায়িত ছবিতে অভিনয় করে অমর দত্ত ('সীতারাম', 'আলীবাবা'), নৃপেন্দ্র বসু ('আলীবাবা'), কুসুম কুমারী ('আলীবাবা'র মর্জিনা) প্রথম বাঙালি চলচ্চিত্রাভিনেতা-অভিনেত্রীর মর্যাদা লাভ করেছেন।

হীরালাল সেন কি তার গ্রামের বাড়িতে ছবির শুটিংও করেছিলেন? এ ব্যাপারে কোনো নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না তিনি একটি তথ্যচিত্র বানিয়েছিলেন পুকুরে স্নানরত গ্রামবাসীদের নিয়ে। অনুমান করা হয় তার বাড়ির দক্ষিণে, পশ্চিমে ও পূর্বে যে তিনটি বড় পুকুরের অস্তিত্ব রয়েছে সম্ভবত এর একটিকেই তিনি ওই ছবির লোকেশন হিসেবে ব্যবহার করেছিলেন।

শেষজীবন হীরালালের নানা দুঃখ কষ্টের মধ্যে কেটেছে। তিনি ছিলেন সৃজনশীল মনের মানুষ। সৃষ্টি নিয়েই মেতে থাকতেন সবসময়। অন্যদিকে তার ছোটভাই মতিলাল

সেন ছিলেন বৈষয়িক চিন্তার মানুষ। এ কারণেই বোধহয় দু'ভাইয়ের মধ্যে একদিন দেখা দেয় মতান্তর। হীরালাল ১৯১৩ সালে রয়্যাল বায়োস্কোপ কোম্পানি মতিলালের হাতে ছেড়ে দেন। পরে তিনি লন্ডন বায়োস্কোপ কোম্পানিতে যোগ দেন একজন সাধারণ কর্মচারী হিসেবে এখানেও বেশিদিন টিকতে পারেননি তিনি কিন্তু তার রক্তে ছিল চলচ্চিত্রের নেশা। তাই আবার জড়িত হন প্রদর্শন ব্যবসায়ী রামদত্তের সঙ্গে, 'শো হাউজ' নামে একটি প্রেক্ষাগৃহ নির্মাণ করেন। কিন্তু এখানেও তিনি হন প্রতারিত। রামদত্ত ছলেবলে 'শো হাউজ'-এর মালিক হয়ে যান। এভাবে নানা কারণে হীরালালের মন, স্বাস্থ্য দুই-ই ভেঙে পড়ে। আর্থিক সঙ্কট দেখা দেয় তার জীবনে। তিনি আক্রান্ত হন ক্যান্সারে। পরে বাধ্য হয়ে তিনি নিজের শেষ সম্বল দুটো ক্যামেরা বন্ধক দিয়ে একজনের কাছ থেকে টাকা ধার নেন। এই ক্যামেরা পরে আর নিজের কাছে ফেরৎ নিতে পারেননি তিনি এর আগেই মৃত্যু এসে গ্রাস করে তাকে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর মাসে মারা যান অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতীয় উপমহাদেশের চিত্রশিল্পের অগ্রপথিক হীরালাল সেন তার সন্তান-সন্ততিদের সম্পর্কে বিশেষ কিছু জানা যায় না। তবে তার এক মেয়ে প্রভাবতী দেবী ছিলেন পরবর্তীকালের নন্দিত অভিনেত্রী সুচিত্রা সেনের চাচাতো শাশুড়ি।

তথ্য নির্দেশ

১. গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, সেন্সর দাগ, ১৯৮২, কোলকাতা, পৃ. ১৮।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২।
৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।
৪. কিরণ্ময় রাহা, বেঙ্গলি সিনেমা, ১৯৯১, কোলকাতা, পৃ. ১।
৫. জগন্নাথ চট্টোপাধ্যায়, চলচ্চিত্রের আবির্ভাব, ১৯৮৪, কোলকাতা, পৃ. ১৪৩।
৬. উদ্ধৃতি, সৈকত আসগর, হীরালাল সেন, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ৩৯-৪০।
৭. শংকর ভট্টাচার্য, বাংলা রঙ্গালয়ের ইতিহাসের উপাদান, ১৯৮৩, কোলকাতা, পৃ. ১৮৭ ও ২৩৩।
৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৪-৩২৫
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯১-৩৯২
১০. উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, ১৯৭৯, পৃ. ১০২-১০৫।
১১. শংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১৯।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১।
১৩. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।
১৪. শংকর ভট্টাচার্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০১।
১৫. মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০
১৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৮।
১৭. উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯।

১৮. সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' ২৪ এপ্রিল, ১৯৯৮ মুনতাসীর মামুন, দৈনিক বাংলা: অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃ. ২

১৯. মুনতাসীর মামুন, উনিশ শতকে ঢাকার থিয়েটার, ১৯৭৯, ঢাকা, পৃ. ১৯।

২০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭।

২১. উদ্ধৃতি, মুনতাসীর মামুন, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০।

২২. উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

২৩. উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯১, ১০০ ও ১০১

২৪. উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৫, ১০৭, ১০৮, ১০৯ ও ১১২

২৫. উদ্ধৃতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১১১-১১৫

২৬. উদ্ধৃতি, মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য, থিয়েটার ও অন্যান্য (সম্পাদনা দিক নারায়ণ ভট্টাচার্য), ১৯৮৭, কোলকাতা, পৃ. ১৬-১৭।

২৭. উদ্ধৃতি, অনুপম হায়াৎ বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, ১৯৮৭, পৃ. ২ ও ৩

২৮. কালীশ মুখোপাধ্যায়, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস, ১৯৬১, কোলকাতা, পৃ. ২৯

২৯. শিশির কুমার গুপ্ত, সাক্ষাৎকার, বকজুরি, মানিকগঞ্জ, ২০ মার্চ, ১৯৮৭।

৩০. অনুপম হায়াৎ, নওয়াব বাড়ির খাজা শামসুল হকের ডায়েরিতে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য, আহসান মঞ্জিলে হীরালাল সেনের বায়োস্কোপ প্রদর্শনী, ছায়ামঞ্চ, দৈনিক বাংলা, ২০ ডিসেম্বর, ১৯৯৫, ঢাকা

৩১. খাজা শামসুল হকের ডায়েরি, ২২ মার্চ, ২৪ মার্চ ও ২৫ মার্চ, ১৯১৫ (অপ্রকাশিত)।

৩২. কালীশ মুখোপাধ্যায়, বাংলা চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাস, ১৯৬১, কোলকাতা; গৌরাঙ্গ প্রসাদ ঘোষ, সোনার দাগ, ১৯৮২, কোলকাতা; দীনেশচন্দ্র সেন, ঘরের কথা ও যুগ সাহিত্য, কোলকাতা। বিস্তারিত বিবরণের জন্য দেখুন সৈকত আসগর রচিত হীরালাল সেন, জীবনীগ্রন্থ, বাংলা একাডেমী, ১৯৯৩, ঢাকা।

দ্বিতীয় অধ্যায়

প্রেক্ষাগৃহের কথা

বাংলাদেশের প্রথম স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহের নাম 'পিকচার হাউজ' (পরে শবিস্তান)। প্রথম মহাযুদ্ধের সময় এটি ঢাকার আরমানিটোলায় স্থাপিত হয়।

প্রেক্ষাগৃহের সাধারণ নাম 'সিনেমা হল' চলচ্চিত্র আবিষ্কারের পূর্বেই নাটকসহ বিভিন্ন বিনোদন উপভোগের জন্য দর্শকদের মধ্যে তৈরি হয়েছিল আগ্রহ। সেই আগ্রহ থেকেই উদ্যোক্তারা বাণিজ্যিকভিত্তিতে স্থায়ীভাবে তৈরি করে হল-মঞ্চ-মিলনায়তন বা প্রেক্ষালয়। উনিশ শতকের নব্বই দশকের দিকে চলচ্চিত্র যখন পূর্ণতা পাচ্ছিল, এর প্রতি মানুষের অগ্রহ বাড়ছিল তখন স্থায়ীভাবে সিনেমা হল তৈরির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় সিনেমা হল তৈরির বিবর্তন সম্পর্কে মজাদার তথ্য রয়েছে মীর্জা তরেকুল কাদেরের 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প' (১৯৯৩) গ্রন্থে।

জানা যায়, ১৮৯২ সালের শুরুতে গতিশীল ছবি যেখানে দেখানো হতো সে স্থানকে বলা হতো 'পেনি আর্কেড' বা 'পিপ শো'। পরে সিনেমা প্রদর্শনের এসব স্থান 'কিনেটোস্কোপ পার্লার' নামে পরিচিতি পায়। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে যুক্তরাষ্ট্রের পিটারসবার্গ শহরে একটি জাঁকজমকপূর্ণ সিনেমা হল নির্মিত হয়। একে বলা হতো 'নিকেলোডিয়ান'। একটি নিকেল মুদ্রা দিয়ে এই হলের টিকিট কেনা যেতো বলে এরকম নাম হয়। 'নিকেলোডিয়ান' ছিল পৃথিবীর প্রথম পূর্ণাঙ্গ সিনেমা হল পাঁচ বছরের মধ্যেই যুক্তরাষ্ট্রে এ ধরনের ১০ হাজার নিকেলোডিয়ান গড়ে ওঠে বর্তমানে পৃথিবীর সবচেয়ে বড় সিনেমা হলটির নাম 'কিনেপোলিশ সিনেমা কমপ্লেক্স'। ১৯৮৮ খ্রিস্টাব্দে এটি নির্মিত হয় বেলজিয়ামের রাজধানী ব্রাসেলস শহরে। এ প্রেক্ষাগৃহের আসন সংখ্যা ৭ হাজার। এখানে একসঙ্গে ২৪টি ছবি প্রদর্শনের ব্যবস্থা রয়েছে।[৮]

আমরা জানি উপমহাদেশের মধ্যে প্রথম বায়োস্কোপ দেখানো হয় ১৮৯৬ সালের ৭ জুলাই বোম্বের ওয়াটশন হোটেলে। পরে বাণিজ্যিকভিত্তিতে ছবি প্রদর্শনের জন্য হল নির্মিত হয়। জামশেদজী ফ্রামজী ম্যাডান ১৯০১ খ্রিস্টাব্দে স্থায়ীভাবে সিনেমা দেখানোর জন্য কোলকাতায় 'ম্যাডান বায়োস্কোপ' নামে হল নির্মাণ করেন। পরে এটি 'এলফিনস্টোন বায়োস্কোপ' নামে পরিচিতি পায়। আরো পরে এটির নামকরণ হয় 'মিনারভা সিনেমা' অন্য একটি সূত্র থেকে জানা যায়, দি এশিয়াটিক সিনেমাটোগ্রাফ কোম্পানি 'পিকচার হাউজ' (পরে বিজু থিয়েটার) নাম দিয়ে স্থায়ী হল নির্মাণ করে ছবি দেখাতে শুরু করে।[৯]

পিকচার হাউজ (শাবিস্তান)

ক্রাউন থিয়েটার, জগন্নাথ কলেজ মিলনায়তন, নওয়াব বাড়ি প্রভৃতি স্থানে ছবি দেখানোর তথ্য পাওয়া যায়। এসব স্থানে মাঝেমধ্যে ছবি দেখানো হতো। স্থায়ীভাবে ছবি দেখানোর ব্যবস্থা হয় আরমানিটোলায় প্রেক্ষালয় স্থাপনের মাধ্যমে। আরমানিটোলার প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সাংবাদিক-পরিচালক, সমালোচক রফিকুজ্জামান 'ঢাকায় প্রেক্ষাগৃহের সূচনা থেকে' শিরোনামে ১৯৮১ সালের ২৬ মার্চ সাপ্তাহিক 'পূর্বাণী' পত্রিকায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পরিবেশন করেছেন। তার তথ্য মতে, এ হলটি স্থাপিত হয় প্রথম মহাযুদ্ধের সময়। এটি ছিল নবাব ইউসুফজান এস্টেটের গোরস্থান। লেজার নামে একজন ইংরেজ এ স্থানটি নিলামে কিনে প্রথমে পাটের গুদাম ও পরে প্রমোদ হল বানান। হ্যারিকেন লণ্ঠনের সাহায্যে এখানে ছবি দেখানো হতো। যুদ্ধের শেষদিকে ইংরেজ বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে লেজার হল ছেড়ে চলে যান। তখন হলটির দায়িত্ব নেন উদ্ধবজী ঠাকুর নামে একজন মাড়োয়ারী। তিনি 'পিকচার হাউজ' নাম দিয়ে দর্শনীর বিনিময়ে এখানে ছবি দেখানো শুরু করেন। পরে হলটির মালিক হন বিক্রমপুরের জনৈক ব্যানার্জী (১৯২২-২৩), রাজেন্দ্রকুমার গুহ ও মতিলাল বসু (১৯৪০)। কর্তৃত্ব বদলের সূত্রে ১৯৫৬ সালে এ হলের মালিক হন ভারত থেকে আগত চিত্র-ব্যবসায়ী মোঃ মোস্তফা (ফেমাস ফিল্মস)। তিনিই হলের নাম বদলে রাখেন 'শাবিস্তান'।

এ হল সম্পর্কে কামরুল হক তুহিনের বর্ণনায় ভিন্নতর তথ্য পাওয়া যায়। তিনি ১৯৯১ সালের ২ মে দৈনিক বাংলায় 'সিনেমার দর্শক চরিত্র বদলে গেছে' শিরোনামে লিখেছেন যে, 'পিকচার হাউজ'-এর আগেকার নাম ছিল 'আরমানিটোলা টকিজ'। ১৯০৫ খ্রিস্টাব্দে একটি বাড়ির (বটুরাজ ভবন) গুদামঘরে এই প্রেক্ষাগৃহ স্থাপন করেন ধীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়।

ঢাকা তথা বাংলাদেশের প্রথম এ হলে সিনেমা দেখার তথ্য পাওয়া যায় ঢাকার নওয়াব পরিবারের বিভিন্ন জনের ডায়েরিতে, বুদ্ধদেব বসু, কিরণ শংকর সেনগুপ্ত, ভবতোষ দত্ত, যোবায়দা মীর্জা, শামসুর রাহমান, সৈয়দ আলী আহসান, কবীর চৌধুরী, সৈয়দ শামসুল হক প্রমুখের লেখায়।

পুরানো ঢাকার বিশিষ্ট অভিনেতা রণেন কুশারী জানিয়েছেন :

১৯২১-২২ সালের কথা। ঢাকায় তখন একমাত্র প্রেক্ষাগৃহ 'পিকচার হাউজ'। এক মাড়োয়ারী ভদ্রলোক এর মালিক। তিনি হল চালাতে পারেন না। পরে হলটির মালিক হন বিক্রমপুরের জনৈক মুখার্জী (১৯২৩)। আমাদের আরমানিটোলা বাসার পাশেই থাকতেন ওই হলের অপারেটর পুলিন ভৌমিক। তিনিই আমাকে জীবনের প্রথম ছবি দেখার সুযোগ করে দেন পিকচার হাউজে। আমি স্কুলে পড়ি, বয়স ৮/৯ বছর। মা'র সঙ্গে গিয়েছিলাম ছবি দেখতে। খোলা মাঠের মধ্যে পর্দা টানানো হয়েছিল, দোতলায় রাখা হয়েছিল প্রজেক্টর। মাঠভর্তি দর্শক। আগে থেকে ঢোল পিটিয়ে প্রচার করা

হয়েছিল যে বিনা টিকিটে ছবি দেখানো হবে— তাই দর্শক সমাগম হয়েছিল প্রচুর। রাত সাড়ে ন'টায় শুরু হয় ছবি— মানে খণ্ড খণ্ড দৃশ্য, নাচ-গান, বক্সিং, ছুটন্ত ট্রেন, লোকজনের কথাবার্তা, সবাই বোবা মানে নির্বাক ১৯২৩ সালে এই হল বাঙালি মালিকানায় গেলে ওই প্রথম কিনা টিকেটে ছবি দেখায়।

১৯২৪ সালে আমি দ্বিতীয়বার এই হলেই বায়োস্কোপ দেখি এক আত্মীয়ের সঙ্গে তখন টিকেটের হার ছিল আসন অনুযায়ী ১ টাকা, ১২ আনা, ৮ আনা ও ৪ আনা। ওই দিন আমরা দেখেছিলাম একটি ফ্যান্টাসি ছবি ছবির একটি দৃশ্যে এক লোককে বেলুনের সাহায্যে বাতাসে ভেসে বেড়াতে দেখা যায়। ইন্টারভ্যালের সময় বাইরে যাওয়ার জন্য আলাদা টিকেট দেয়া হয়। আমরা ভাবলাম ছবি বুঝি শেষ, বাড়ি চলে আসি। পরদিন একজনের কাছে ছবি দেখার গল্প করছিলাম। লোকটি বললো, 'দূর বোকা, তোরা তো অর্ধেক ছবি দেখেছিস। ওই টিকিট দেয়া হয়েছিল বাথরুমে যাওয়া অথবা বাইরে গিয়ে চীনে বাদাম বা অন্য কিছু খাওয়ার জন্য।' লোকটির কথা শুনে নিজেদের বোকামির জন্য দুঃখ হয়েছিল সেদিন।[৪]

জানা যায় ঢাকায় প্রথম নিয়মিত প্রদর্শনী শুরু হয় পিকচার হাউজে গ্রেটা গার্বো অভিনীত একটি ছবি দিয়ে : এই প্রেক্ষাগৃহে পরে অচ্ছ্যুৎ কন্যা, মডার্ন টাইমস, ট্রেডার হর্ন, দি কিড, কর্মবীর, গ্যালপিং গোস্ট, খাজাঞ্চি, দাসী প্রভৃতি ছবি দেখানো হয়।

সিনেমা প্যালেস (রূপমহল)

ঢাকার নিয়মিত দ্বিতীয় প্রেক্ষাগৃহ হচ্ছে সদরঘাট এলাকায় অবস্থিত 'সিনেমা প্যালেস'। পরে এটি 'রূপমহল' নামে পরিচিতি পায়। এটি ১৯২৪ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। 'সিনেমা প্যালেস' স্থাপিত হয় বাংলা বাজারের জমিদার সুধীরচন্দ্র দাসের জমির ওপর ইজারা নিয়ে। কে প্রথম এ 'সিনেমা প্যালেস' তৈরি করেন এ নিয়ে মতভেদ রয়েছে। কেউ বলেন, এর প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন রূপলাল দাস, কেউ বলেন ধীরেন রায় ও শচীন ব্যানার্জী পরে এ হলের মালিকানা চলে যায় এক মাড়োয়ারীর হাতে। সেইসঙ্গে বদলে যায় নামও। 'সিনেমা প্যালেসে'র নতুন নামকরণ হয় 'মোতিমহল'। 'মোতিমহল' পরে মুকুল ব্যানার্জীর 'ঢাকা পিকচার্স প্যালেস' লিমিটেড কোম্পানির অধীনে চলে যায়। সেইসঙ্গে এর নামও বদলে রাখা হয় 'রূপমহল'।[৫]

'সিনেমা প্যালেস' বা 'মোতিমহল' এ বিশ ও ত্রিশের দশকে প্রদর্শিত ছবির মধ্যে ছিল 'বিল্বমঙ্গল', 'দেবী চৌধুরাণী', 'জয়দেব', 'ঋষির প্রেম', 'দুর্গেশনন্দিনী', 'দি গুড আর্থ', 'দিদি' প্রভৃতি। বঙ্কিমচন্দ্রের কাহিনী অবলম্বনে প্রিয়নাথ গাঙ্গুলি পরিচালিত 'দুর্গেশনন্দিনী' ১৯২৯ সালে এই প্রেক্ষাগৃহে যখন মুক্তি পায় তখন মুসলিম সম্প্রদায়ের মধ্যে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। প্রেক্ষাগৃহ পুড়িয়ে দেয়ার হুমকি দেয়া হয় বিভিন্ন মহল থেকে কর্তৃপক্ষ তখন বাধ্য হন এ হলে পুলিশ পাহারার ব্যবস্থা করতে। পরে অবশ্য মুসলিম সম্প্রদায়ের আপত্তির কারণে ছবি থেকে দুটি অসহনীয় দৃশ্য কেটে বাদ দেয়া

হয়। একই ধরনের ঘটনার সূত্রপাত হয় ছবিটি নারায়ণগঞ্জের প্রদর্শনের বেলায়ও এ ব্যাপারে কোলকাতার 'বাংলার কথা' পত্রিকায় ১৯২৯ সালের ৩১ জানুয়ারি সংখ্যায় সংবাদও ছাপা হয়

'রূপমহল'-এর মালিক মুকুল ব্যানার্জী নিহত হলে এর মালিক হন তার পুত্র কমল ব্যানার্জী। ১৯৫৬ সালে এ প্রেক্ষাগৃহেই মুক্তি পায় বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাকচিত্র 'মুখ ও মুখোশ'। মালিকানা বদলের সূত্র ধরে পরে এই প্রেক্ষাগৃহের অন্যতম স্বত্বাধিকারী হন ইফতেখারুল আলম ও এইউএম খালীলুল্লাহ।[৫] হলটি বর্তমানে অবলুপ্ত।

লায়ন সিনেমা

জুবিলি স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী লাল রায় চৌধুরী মহারানী ভিক্টোরিয়ার রাজ্য শাসনকালের ৬০ বছর পূর্তি উপলক্ষে 'ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটার' প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৮৭ খ্রিস্টাব্দে ইসলামপুরের আশেক লেনের এক টিনের বাড়িতে এই নাট্যভবনের প্রতিষ্ঠা হয়। পরবর্তীকালে এ নাট্যভবন ঢাকার সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব মীর্জা আবদুল কাদের সর্দারের হাতে চলে যায়। এটা বিশ শতকের গোড়ার দিকের কথা। কাদের সর্দার ডায়মন্ড জুবিলি থিয়েটারের নাম বদলে রাখেন 'লায়ন থিয়েটার'। তিনি নাটকের প্রতি লোকজনের আকর্ষণ কমে যায়। মীর্জা আবদুল কাদের সর্দার তখন 'লায়ন থিয়েটারে' চলচ্চিত্র দেখাতে শুরু করেন সেইসঙ্গে নামও বদলে রাখেন 'লায়ন সিনেমা' (১৯২৭)।[৫] এই 'লায়ন সিনেমা'য়ই প্রথম মুক্তি পায় উপমহাদেশের সবাকচিত্র 'আলম আরা'।

নাট্যমঞ্চ থেকে 'লায়ন সিনেমা' হলে পরিণত হয় ১৯২৭ সালে। হলে বায়োস্কোপের যন্ত্রপাতি বসানোর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন মীর্জা ফকির মোহাম্মদের শিশুপুত্র হামিদুর রহমান (পরবর্তীকালের বিশিষ্ট শিল্পী ও শহীদ মিনারের ডিজাইনার) এই তথ্য জানিয়েছেন হামিদুর রহমানের ভাই বিশিষ্ট নাট্যকার সাঈদ আহমদ। ১৯৩১ সালে লায়নে স্থাপন করা হয় সবাকচিত্রের যন্ত্রপাতি। এর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয় মীর্জা ফকির মোহাম্মদের আরেক শিশুপুত্র সাঈদ আহমদের হাতে।[৬]

ত্রিশের দশকে 'লায়ন সিনেমা' হলে প্রদর্শিত ছবির মধ্যে ছিল 'বোম্বাই কি বিল্লি', 'আলী বাবা আওর চল্লিশ চোর', 'কিং সলোমন'স মাইনস', 'স্যামসন অ্যান্ড ডেলিলা', 'জুলিয়াস সিজার', 'লা পারওয়া', 'প্রাণ প্রেয়সী' প্রভৃতি।

'লায়ন সিনেমা' প্রসঙ্গে এসে যায় মির্জা আবদুল কাদের সর্দারের কথাও। কাদের সর্দারের জন্ম ১৮৮৯ সালের ১ নভেম্বর মেধাবী, বুদ্ধিমান, প্রভাবশালী, সমাজ সচেতন মির্জা আবদুল কাদের মাত্র ২৫ বছর বয়সেই ঢাকার তৎকালীন নওয়াব খাজা স্যার সলিমুল্লাহর কাছ থেকে সর্দার হিসেবে উপাধি পান। ১৯০৫ সালে তিনি ছিলেন ঢাকার সব মহল্লার সেরা সর্দার। সামাজিক কাজকর্মের পাশাপাশি তাঁর ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল রাজনীতির সঙ্গে। ১৯১২ সালের দিকে তাঁর বাড়িতেই বসতো রাজনৈতিক বৈঠক

সংস্কৃতিমনা কাদের সর্দার ঢাকার নাট্যচর্চা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের ক্ষেত্রে একজন অগ্রপথিক। তিনি ছিলেন একজন চলচ্চিত্র পরিবেশকও। তাঁর প্রতিষ্ঠানের নাম ছিল 'টাইগার ফিল্মস'। ১৯৬৩ সালের ২৭ আগস্ট মির্জা আবদুল কাদের মারা যান। তাঁর একমাত্র পুত্র মির্জা আবদুল খালেক পরে চলচ্চিত্র প্রদর্শন, পরিবেশনা ও প্রযোজনায় জড়িত হন।

মির্জা আবদুল কাদের সর্দারের ভাই মির্জা ফকির মোহাম্মদও জড়িত ছিলেন নাট্যচর্চা ও চলচ্চিত্র প্রদর্শনের সঙ্গে।[৮]

বিশিষ্ট নাট্যকার সাঈদ আহমদ লিখেছেন :

লায়ন থিয়েটারের জন্ম এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে। বিভিন্ন সময় কোনো জমিদারের বা কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির হাত বদল হতে হতে বিশের দশকে মীর্জা এফ মোহাম্মদ এবং মীর্জা আবদুল কাদির এই দুই ভাইয়ের হাতে এসে পড়ল এর ভার। এই মীর্জা ভ্রাতৃদ্বয় ইসলামপুর এলাকার অধিবাসিন্দা ছিলেন। সেই যুগে ইসলামপুর পাটুয়াটুলী, তাঁতীবাজার, নওয়াবপুর, আরমানিটোলা, চকবাজার প্রভৃতি এলাকাতেই ধনাঢ্য জমিদার আর বড় ব্যবসায়ীদের বসবাস ছিল। তার মানে এ এলাকাকেই ঢাকার প্রাণকেন্দ্র বা গিনজা বলা যেতে পারে। এই গণ্ডির ভেতরেই তখনকার বারবণিতাদের হাট বসতো। সাচিপন্দর, নবনারায়ণ লেন, কুমারটুলী ইত্যাদিতে পাটুয়াটুলী থেকে ওয়াইজঘাট যাওয়ার পথে যদি মোড়ে এসে ডান দিকে তাকান তাহলে একটা দোতলা বাড়ি দেখা যেত। নিচের তলায় প্রখ্যাত পানবিক্রেতা নন্দলাল ওরফে নান্দুর দোকান ছিল, লোক ছিল বেনারসের, কালচক্রে ঢাকায় এসে পানের দোকান খুলে শহর মাতিয়ে ফেলে। ত্রিশের দশকে আমি এই সুপুরুষ হিন্দুভাষী আতরের গন্ধে জড়ানো পান বিক্রেতাকে দেখেছি। ঠিক এর উপরতলায় নামকরা বাঈজীদের বাসস্থান ছিল। উত্তর ভারত থেকে বাঈজী বা কণ্ঠশিল্পীরা এলে এখানে এসে উঠতেন। বাড়িটার নাম ছিল গঙ্গাজলি। নামটার তাৎপর্য তখন বুঝতে পারিনি। খুব ভোর বেলায় এই বাড়ির মহিলারা গোসল করতে বুড়িগঙ্গায় যেতেন এবং গোসল সেরে কিছুক্ষণ পর খালিগায়ে গামছা জড়িয়ে ফেরত আসতেন। রাস্তার দু'ধারে ছেলে-বুড়ো অনেকেই দাঁড়িয়ে এ দৃশ্য দেখত। এটা কেমন শহর ছিল তখন? নান্দুর পান খেতে দূর-দূরান্ত থেকে লোকেরা আসতো। এর আশপাশেই বনেদি সোনারদের দোকান ছিল। এদের হস্তকর্ম মোগল দরবারেও তাক লাগিয়ে দিয়েছিল। এরপরে ইসলামপুরে আব্বাসের পরাটা, কাবাব আর বাখড়খানির দোকানে সবসময়ই ভিড় লেগে থাকত। এ দোকানের উল্টোদিকের রাস্তাটি নবাববাড়ির গা ঘেঁষে ওয়াইজঘাটে গিয়ে মিলেছে— এটাও দুটো জিনিসের জন্য আকর্ষণীয় ছিল। রাস্তার বাঁ-ধারে ক্রাউন থিয়েটার এক সময় অবস্থিত ছিল— এটা মাড়োয়ারী ব্যবসায়ীরা চালাত। কিছুদিন পর যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন পরিত্যক্ত অবস্থায় অনেকদিন পড়ে রইল। এ এলাকার প্রথম বরফকল এই বিল্ডিংকে ঘিরেই এবং তার আশপাশে অবস্থিত ছিল। ত্রিশের গোড়ার দিকে বরফকলও বন্ধ হয়ে

গিয়েছিল তারপর থেকে কেউ আর উদ্যোগ নেয়নি আনন্দামোদীদের জন্য নাটক ও তৃষ্ণার্তদের বরফ তৈরি করে দেয়ার এবারে লায়ন সিনেমার কথায় আসি। ইসলামপুরে লায়ন থিয়েটার অবস্থিত ছিল। এখানে হিন্দি, উর্দু ও বাংলা নাটক পরিবেশিত হতো কিন্তু থিয়েটারের কর্মকাণ্ডে ভাঁটা পড়লো যখন নির্বাক চলচ্চিত্রের আবির্ভাব ঘটল এ শহরে, থিয়েটার যখন বন্ধ হয়ে গেল তখন নাটকের কলাকুশলী অভিনেতা-অভিনেত্রী বেকার হয়ে পড়লেন। যে সুদর্শন পুরুষ কাল পর্যন্ত সম্রাট জাহাঙ্গীরের ভূমিকায় স্টেজে চাঞ্চল্য সৃষ্টি করতেন, যে রূপবতী মহিলা লায়লার ভূমিকায় গান গেয়ে কেবল মজনুকে নয়, দর্শকদেরও চোখে জল আনতে পারতেন তারা সবাই যেন রাতারাতি নিরর্থক হয়ে পড়লেন। কারণ লায়ন থিয়েটারই সত্যিকার অর্থে ঢাকার সর্বশেষ থিয়েটার কোম্পানি ছিল। শিল্পীদের অনেককেই যেখান থেকে এসেছিল সেখানে ফিরে যেতে হলো। কেউ কোলকাতা, কেউ বানারস, কেউ লাখনৌ বা বোম্বে। আমাদের পূর্ববঙ্গেও কিছু কিছু শিল্পী ছিল কিন্তু মজার ব্যাপার হলো বেশিরভাগ লোকই ঢাকায় রয়ে গেল। এই শহরে তারা জীবনের বেশকিছু সময় কাটিয়েছে নাট্যধারাকে আরো গতিশীল করেছে; যথেষ্ট পয়সা বানিয়েছে এ শহরের লোকশিল্পীদের স্বভাবতই ইজ্জত করে। তাই ছোটখাটো শিল্পীও ইসলামপুরের ভোরবেলায় চৌরাস্তায় দাঁড়ালে ফজলুর ডালপুরীর দোকান বা আব্বাসের বাখড়খানির দোকান থেকে আমন্ত্রণের ডাক নিশ্চয়ই শুনতে পেতেন। পয়সা দেবে কি না সেটা বড় কথা নয়। খদ্দেরের সঙ্গে বসে কিছুক্ষণ নাট্যজগৎ নিয়ে গল্পগুজব করবে এতেই বা আনন্দ কম কি। যদিও সেদিন আর রইল না তবুও সেই ডিজাইনার ফটিকচন্দ্র সিন পেইন্টার হয়ে গেল। ছোট ছোট চরিত্রে যারা অবতীর্ণ হতো তারা কেউ গেলকিপার, কেউ প্রজেকশনিস্ট হয়ে গেল। সবচেয়ে মজা হলো বাদ্যযন্ত্রীদের নিয়ে। সে সময়কার নির্বাক চলচ্চিত্রে সিকুয়েন্স মুড মিউজিক পরিবেশন করতে হতো স্টেজের পাশে আপরাইট পিয়ানো রাখা থাকতো, অন্যদিকের উইংয়ে হারমোনিয়াম তবলা বেহালা সাজানো থাকতো। যখন কোনো উত্তেজনাপূর্ণ দৃশ্য আসতো, ধরুন নায়ক পিছু নিয়েছে ভিলেনের, তখন বাদ্যযন্ত্রের কলতান অত্যন্ত ফলপ্রসূ হতো ভিলেন দৌড়ে পালাচ্ছে আর তার পেছনে পেছনে নায়ক আর সেই পাড়ার লোকজনও শত্রুকে পাকড়াও করতে ছুটেছে। আবার ধর ধর করতে করতে শত্রুপক্ষ হঠাৎ কোনো এক গলির ভেতরে ঢুকে পড়ল। শত্রু বাগে আসছে না। পরে শার্টে দেখা যাচ্ছে ভিলেন দোতলা বাড়ির শয়নকক্ষে ঢুকছে। এবারে শয়তানটা নিশ্চয়ই হয় নায়িকাকে লাঞ্ছিত করবে আর না হলে সোনার গহনাবাক্স ধস্তাধস্তি করে কেড়ে নেয়ার চেষ্টা করবে। বুঝতেই পারছেন, এসব টেনশন উদ্রেককারী সিকোয়েন্সকে প্রাণবন্ত করার জন্য বেশ কয়েকজন অভিজ্ঞ এবং গুণী বাদকের কত প্রয়োজন ছিল। উইংগস-এর পাশে আপরাইট পিয়ানো বাজিয়ে এফেক্ট মিউজিক পরিবেশন করতেন। পিয়ানোর দু'ধারে মোমবাতি জ্বালানো থাকতো এবং সেই হাল্কা আলোতে 'স্কোর শিট' উল্টে উল্টে দেখতেন মাস্টার সাহেব।

থিয়েটারের যুগে সঙ্গীত পরিচালককে সম্ভ্রমে সবাই মাস্টার সাহেব বলে সম্বোধন করতো। আবার যখন বুক ফাটানো কান্না জড়ানো হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা হতো তখন ভায়োলিন, বাঁশি, আর ক্ল্যারিওনেটের ডাক পড়তো, দেখতে দেখতে নির্বাক চিত্রের যুগও শেষ হয়ে গেল এবং ৩৫ মিলিমিটারের সবাক সলচ্চিত্র সবাইকে ঠেলেঠুলে রাজাসনে বসে পড়ল। বুঝতেই পারছেন জাঁদরেল শিল্পী আর কলাকুশলীরা আরেকবার বেকার হয়ে পড়লেন চোখের সামনে। সেই স্টেজও নেই, তাই নায়ক-নায়িকার প্রয়োজনও নেই। পেছনে উদ্যান অঙ্কিত সিনসিনারীর বাহারও নেই। সঙ্গীতশিল্পীরা বাঁশি, বেহালা নিয়ে অন্যত্র চলে গেলেন। এই লায়ন থিয়েটারের স্টেজের ওপর পর্দার পেছনে আমি অন্ততপক্ষে দশটি আপরাইট পিয়ানোকে অত্যন্ত অবহেলায় খুনে জর্জরিত হতে দেখেছি। ১৯৩১ সালে লায়ন থিয়েটার পুরোপুরি লায়ন সিনেমায় রূপান্তরিত হলো রঙিন সিন-সিনারির জায়গায় সাদা স্কেুলার কাপড়ের পর্দা টাঙানো হলো ওরই ওপর প্রতিফলিত হবে বিরাটকায় RCA প্রজেক্টর থেকে বোম্বের তৈরি বিভিন্ন উপাখ্যান। কোলকাতার তৈরি ছবিও বহুল সমাদৃত ছিল। কিন্তু লায়ন সিনেমায় বোম্বের ছবি বেশি প্রদর্শিত হতো। দোতলা এ প্রেক্ষাগৃহটি বেশ চওড়া এবং লম্বা ছিল। সারনা নামের এক প্রখ্যাত ফারসি ইঞ্জিনিয়ার এই ACA মেশিনের সঙ্গে ঢাকায় এলেন গোটা জিনিসটাকে চালু করার জন্য। সিনহা নামে আরেকজন ইঞ্জিনিয়ার তার সঙ্গে ছিলেন। তিনি ম্যাডান থিয়েটারের সঙ্গে বহুদিন জড়িত ছিলেন। তার হাতের পরশে কাজ্জান বাই ওহিদান বাই, মাস্টার ভিটাল বা মাস্টার নেসারের কণ্ঠস্বর জীবন্ত হয়ে উঠত। সেই যুগের টেকনোলজি অনুযায়ী এসব কুশলী সবাকচিত্রকে দর্শকের মাঝে জনপ্রিয় করতে যতেষ্ট অবদান রেখেছেন লায়ন সিনেমায় সেই যুগে ইসলামপুর চকবাজার ইত্যাদি এলাকার সম্ভ্রান্ত লোকেরা ছবি দেখতে আসতেন। কিন্তু থার্ড ক্লাস ইন্টার ক্লাসে মুটে, মজুর, ওস্তাগার, বয়-বেয়ারা আর কলেজের ছাত্রদের একাংশ ঝাঁপিয়ে পড়ত। টিকেটের হার মুকুল সিনেমা (বর্তমান আজাদ) বা পিকচার হাউস (শাবিস্তান) থেকে অনেক কম ছিল। যার ফলে জনগণের চাহিদ পূরণ করতে এই প্রেক্ষাগৃহ এক অনন্য ভূমিকা পালন করেছে লায়ন সিনেমার দর্শকদের একটা বিশেষ চিত্ররূপ পাওয়া যায় যেমন ধরুন, একেবারে দিনমজুর (ওস্তাগার যোগালি, কাঠ ও রঙ মিস্ত্রি ইত্যাদি) নিম্নমধ্যবিত্ত ছোট ছোট দোকানী (ডালপুরীর দোকান, পিঠার দোকান, পানের দোকন ইত্যাদি) অনেক শ্রেণীর দর্শক সিনেমা দেখতো বেঞ্চে স্টান শুয়ে। হাতেম তাই সিরিয়াল হতো গোটা রাত ধরে। যেহেতু তারা ছিল দিনমজুর ও শ্রমিকশ্রেণী, তাই গোটা দিনের হাড়ভাঙা খাটুনির পর সিনেমা দেখতে দেখতে কিছুক্ষণ ঘুমিয়ে ক্লান্তি দূর করত কখনোবা ভিলেনের কূটকৌশল, নায়িকার অপহরণ দৃশ্য তাদের মনঃপূত না হলে হাতের বিড়ির টুকরো বা অন্য কিছু পর্দায় ছুঁড়ে দিয়ে নিজেদের ক্ষোভ প্রকাশ করত। মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়ের অল্প শিক্ষিত ও শিক্ষিত পেশাজীবী ও ব্যবসায়ী এবং ছাত্রদের বিরাট গোষ্ঠী, আর সব ক্ষেত্রে শহরের ধনাঢ্য ও

খান্দানি ব্যক্তিরা (নবাব বাড়ির ব্যক্তিবর্গ, চকবাজার খাজে দেওয়ানের পুরনো ফ্যামিলির লোকেরা ইত্যাদি) একটা বিশেষ জিনিস লক্ষণীয় যে যেহেতু ঢাকায় ত্রিশের দশক এবং পরে কথা নেই বার্তা নেই হঠাৎ করে হিন্দু-মুসলমান দঙ্গা বেঁধে যেত— তাই দুই সম্প্রদায়ের লোকেরাই নাটই শো দেখতে খুব হিসাব করে যেত। তাই মুসলমানেরা বেশিরভাগই লায়ন সিনেমায় ছবি দেখতে নিরাপদ বোধ করত। কারণ এ সিনেমা মুসলমানদের মহল্লায় অবস্থিত ছিল। হঠাৎ রায়ট বেঁধে রাস্তাঘাট জনশূন্য হয়ে গেলেও বাড়ি ফিরে যাওয়া অসম্ভব ছিল না। তবে মাঝে মাঝে ধনাঢ্য হিন্দু ব্যক্তিরা লায়ন সিনেমায় আসতেন না বা মুসলমানেরা মুকুল (আজাদ) বা রূপমহল সিনেমায় যেতেন না এমন কথা নয় তবে চল্লিশের দশকে ভাগাভাগিটা বেশ প্রকট হয়ে গিয়েছিল। একটা গল্প প্রচলিত যে, লায়ন সিনেমার মালিক জনাব কাদের সরদার যে পয়সা পারিশ্রমিক দিতেন শ্রমিকদের তার সিকিভাগ সুকৌশলে সিনেমা হলের মারফত উঠিয়ে নিতেন। ওই মহল্লায় অবস্থিত যারা তার বড় বড় অট্টালিকার মেরামত কাজ ও সৌকর্য বৃদ্ধির কাজে সারা দিন নিয়োজিত থাকত এবং বিনিময়ে ২ টাকা পেত তারাই মালিকের হলে ফিরে আটআনা খরচ করে সিনেমা দেখে মজুরির একটা অংশ ফেরতও দিত যে ওস্তাগারটি ভোর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত কাজ করে দিনের মজুরি পেত তার কিছু অংশ খরচ করে সে থার্ড ক্লাসের টিকিট কিনে হাতে বিড়ি আর মুখে পান চিবোতে চিবোতে প্রেক্ষাগৃহের ভেতরে প্রবেশ করত। থার্ড ক্লাসে সে সময় লম্বা কাঠের বেঞ্চি ছিল। ইন্টার ক্লাসে টিনের চেয়ার, সেকেন্ড ক্লাসে কাঠের চেয়ার এবং ফার্স্ট ক্লাসে অল্প গদিঅলা চেয়ার পরিবেশন করা হতো। আরো ওপরের ক্লাসে সোফা রাখা থাকত। আমি ওস্তাগারের কথায় ফিরে আসছি। সারা দিন হাড়ভাঙা খাটুনির পর নবীন ওস্তাগার গনি মিঞা হাতমুখ ধুয়ে চট করে টিকিট কেটে ঢুকেই থার্ড ক্লাসের সেই লম্বা বেঞ্চির ওপর সটান শুয়ে পড়ত। কারণ শুয়ে শুয়ে ছবি দেখতেই ওর ভালো লাগত। হান্টারওয়ালী ছবির নায়িকা নাদিয়া (ইনি সম্ভবত অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান ছিলেন) দুর্দান্ত অভিনয় করতেন, বিশেষ করে মারামারির সিকোয়েন্সে। জন কাওয়াস আর নাদিয়ার জুটি ঢাকার নিম্নমধ্যবিত্ত পুরুষদেরকে নিজের মুঠোয় নিয়ে নিয়েছিল। ত্রিশের দশকের ওস্তাগার গনি মিয়া সুরিটোলার অধিবাসী। সোজা হয়ে বসে ছবি উপভোগ করা তার পক্ষে অসম্ভব ছিল। সে বোধ হয় সারা জীবনই হরাইজোনটালভাবে ছবি দেখেছেন। তার বাবা ঢাকার নামকরা ওস্তাগার সালামত মিয়া। ওরই জীবনের ওপর ভিত্তি করে এই দেশের প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য প্রামাণ্যচিত্র জনাব নাজির আহমদ ঢাকায় তৈরি করেন ১৯৫৪ সালে। ষাট বছরের বৃদ্ধ সালামত মিয়া এই ছবির নায়করূপে অবতীর্ণ হন।

মুকুল (আজাদ)

মুড়াপাড়া (নারায়ণগঞ্জ জেলার রূপগঞ্জ উপজেলার অধীন) জমিদার মুকুল ব্যানার্জীর কথা আগেই বলা হয়েছে। ঢাকার প্রাচীনতম চলচ্চিত্র প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা পিকচার্স

প্যালেস'-এর তিনি প্রতিষ্ঠাতা। এ কোম্পানির অধীনে ভিক্টোরিয়া পার্কের উত্তরে কোর্ট হাউজ এলাকায় ১৯২৮-২৯ সালের দিকে স্থাপিত হয় 'এমপায়ার থিয়েটার' পরে তা হয় 'মুকুল' প্রেক্ষাগৃহ। এ হলের একটি শেয়ার কিনেছিলেন সুপণ্ডিত অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। 'মুকুল'-এ মুক্তি পেয়েছিল ঢাকায় নির্মিত প্রথম পূর্ণাঙ্গ নির্বাকচিত্র 'শেষ চুম্বন' ('দি লাস্ট কিস')। বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাকচিত্র 'মুখ ও মুখোশ'-এর প্রথম বিশেষ প্রদর্শনীও এ হলে অনুষ্ঠিত হয়েছিল ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট সকালে।

ত্রিশের দশকে এ প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত ছবির মধ্যে ছিল 'চণ্ডীদাস', 'সীতা', 'কপাল কুণ্ডলা', 'সাইন অব দ্য ক্রশ', 'সোনার সংসার', 'প্রহলাদ' 'গোরা', 'অ্যাব্রোকলস অ্যান্ড দ্য লায়ন', লরেল হার্ডি ও চার্লি চ্যাপলিনের বিভিন্ন ছবি।

১৯৩৪ সালে এখানে দেখানো হয় যুদ্ধের ধ্বংসলীলা ও প্রেমের মর্মস্পর্শী কাহিনী সমৃদ্ধ স্বর্ণপদকপ্রাপ্ত ছবি, 'এ ফেয়ারওয়েল টু আর্মস'। ১৯৩৫ সালে দেখানো হয় 'ডাকু মনসুর', 'পাতালপুরী', 'বিদ্যাসুন্দর', 'মণি কাঞ্চন' প্রভৃতি ছবি।

'ঢাকা পিকচার্স প্যালেস লিমিটেড'-এর অধীন এ প্রেক্ষাগৃহটিও মুকুল ব্যানার্জী নিহত হওয়ার পর তার পুত্র কমল ব্যানার্জীর মালিকানায় চলে যায়। ষাট দশকের মধ্যভাগে এই প্রেক্ষাগৃহের মালিকানায় চলে যায় ইফতেখারুল আলম ও এ ইউ এম খালীলুল্লাহ কাছে।

মানসী (নিশাত)

ঢাকার বংশাল এলাকায় নিউ পিকচার্স লিমিটেড কোম্পানির অধীনে 'মানসী' প্রেক্ষাগৃহ স্থাপিত হয় ১৯৩৯ খ্রিস্টাব্দে। জনৈক হিন্দু ভদ্রলোক ছিলেন এ প্রেক্ষাগৃহের প্রতিষ্ঠাতা মালিক। হলটি পরে বলিয়াদীর জমিদার পরিবারের চৌধুরী আবরার আহমেদ সিদ্দিকী ও চৌধুরী লবিবউদ্দিন আহমদ কিনে নেন। মালিকানা এবং সময় পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে হলটির নামও পরিবর্তন হয়েছে 'মানসী' নাম পরিবর্তন করে একবার 'নিশাত' রাখা হয়। পরে তা পরিবর্তন করে আবার 'মানসী'ই রাখা হয়।

প্যারাডাইস

এ প্রজন্মের তরুণ-তরুণী জানে কি ঢাকার বুক থেকে তিনটি প্রেক্ষাগৃহ বিলুপ্ত হয়ে যাওয়ার কথা? হয়তো 'কেউ জানে কেউ জানে না'। বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া এ তিনটি প্রেক্ষাগৃহের নাম হচ্ছে তাজমহল, প্যারাডাইস ও ব্রিটানিয়া। এর মধ্যে তাজমহল প্রেক্ষাগৃহটির অবস্থান ছিল পুরনো ঢাকার বাণিজ্যিক এলাকা মৌলভীবাজারে, প্যারাডাইস ছিল কেন্দ্রীয় জেলখানা এলাকায়, ৩ নম্বর আলী নকীর দেউড়ি (সাতরওজায়) আর ব্রিটানিয়া ছিল গুলিস্তান এলাকায়, জাতীয় গ্রন্থ ভবন সংলগ্ন। তাজমহল অবলুপ্ত হয় কয়েক বছর আগে, আশির দশকে।

প্যারাডাইস অবলুপ্ত হয় ১৯৫৭-৫৮ খ্রিস্টাব্দের দিকে আর ব্রিটানিয়া অবলুপ্ত হয় এর কয়েক বছর আগে।

এফডিসি থেকে প্রকাশিত 'বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস' (১৯৮৭) গ্রন্থে পুরানো ঢাকার প্রেক্ষাগৃহ নিয়ে বিশেষ করে শাবিস্তান (পিকচার হাউজ), রূপমহল, মুকুল (আজাদ), লায়ন প্রেক্ষাগৃহ সম্পর্কে মোটামুটি বিস্তারিত তথ্য আছে। কিন্তু ওখানে ঢাকার গুরুত্বপূর্ণ তিনটি হল তাজমহল, প্যারাডাইস ও ব্রিটানিয়া সম্পর্কে তথ্য নেই।

১৯৮৮ সালের দিকে ঢাকার নওয়াব খাজা ইউসুফজানের অধঃস্তন পুরুষ খাজা মোহাম্মদ সাজেদের (এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে প্রবাসী) সহায়তায় নওয়াব পরিবারের বিশিষ্ট ব্যক্তি খাজা মোহাম্মদ হালিমের সঙ্গে পরিচিত হই। খাজা হালিমের বাড়িটিকে একটি ছোটখাটো মিউজিয়াম বলা যেতে পারে। তার সংগ্রহে নওয়াব পরিবারের বহু মূল্যবান ও দুষ্প্রাপ্য নিদর্শন রয়েছে। এসবের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ব্যক্তির লেখা ডায়েরিও। এ ডায়েরি লেখকদের একজন খাজা শামসুল হক। তিনি ১৯০৫ থেকে ১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ডায়েরি লিখেছেন। এ ডায়েরিতে ব্যক্তিগত ও পারিবারিক প্রসঙ্গ ছাড়াও রয়েছে ঢাকা তথা বাংলার সামাজিক, সাংস্কৃতিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও ক্রীড়াবিষয়ক অনেক তথ্য। খাজা হালিমের মারফতই জানতে পারি যে, ডায়েরি লেখক খাজা শামসুল হকের মেয়ের জামাই লাল মিয়া হচ্ছেন সাতরওজায় অবস্থিত বিলুপ্ত সেই প্যারাডাইস হলের মালিক।

লাল মিয়ার আসল নাম আবু আহমদ শরফুদ্দিন। ১৯৯০ সালের ১৩ নভেম্বর জিন্দাবাহার এলাকার ১৪ নম্বর সৈয়দ হাসান আলী লেনস্থ বাসায় গিয়ে তার সঙ্গে দেখা করি। তার সঙ্গে আলাপে জানতে পারি যে, তিনি শুধু পুরনো ঢাকার প্রেক্ষাগৃহ প্যারাডাইস-এর মালিকই নন, অনেক ঘটনা এবং ইতিহাসের জীবন্ত সাক্ষীও

লাল মিয়ার জন্ম ১৯০৯ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায়। পিতা ফায়েজুদ্দীনের একমাত্র সন্তান তিনি। সচ্ছল পরিবারের একমাত্র সন্তান বিধায় লেখাপড়ার চেয়ে ক্রীড়া ও বিনোদন চর্চায়ই সময় কাটতো তার। কোলকাতায় গিয়ে বক্সিংয়ে খুব নাম করেন। ওই সময় পরিচিত হন সেকালের নামকরা গায়িকা-নায়িকাদের সঙ্গে। বহু বালা-দেবী বাঈদের সঙ্গে তার ছিল পরিচয়

লাল মিয়ার পিতা রেলওয়ে বিভাগের চাকরি থেকে অবসর নেন ১৯৩৬ খ্রিস্টাব্দে। ওই সময় তিনি অনেক টাকা পান। তার পরিচয় ছিল পুরনো ঢাকার মোখলেসুর রহমান চৌধুরী ও আরিফুর রহমান চৌধুরীর সঙ্গে। তারা তাকে সিনেমা হল নির্মাণের প্রস্তাব দেন। হল নির্মাণের শেষ পর্যায়ে ফাঁস হয়ে পড়ে যে ওই দু'জন তার পিতাকে ঠকিয়েছে। এমতাবস্থায় লাল মিয়া নিজেই উদ্যোগী হয়ে সিনেমা হল নির্মাণের কাজ শেষ করেন। ১৯৩৮ সালের ২ ফেব্রুয়ারি থেকে প্যারাডাইস টকিজ হল চালু হয় 'জেলরস' ছবি দিয়ে। ১৯৪০ খ্রিস্টাব্দে হল বন্ধ হয়ে যায়। প্রজেক্টর মেশিন ক্রয় বাবদ

মূল্য পরিশোধে ব্যর্থতার জন্য 'ফিলিপস (কোলকাতা) কোম্পানি ঐ মেশিন সিজ করে নেয়। ১৯৪৭ খ্রিস্টাব্দে হল আবার চালু হয়। অন্য পার্টিকে দেয়া হয় লিজ হল চালু থাকে ১৯৫৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত হলটি নিউ প্যারাডাইস নামে পরে আবার চালু হয়। শফিউর রহমান নামে এক ব্যক্তি হলটি চালাতেন। লাল মিয়া জানান, ওই লোক তাকে প্রতারণা করে। হল গোপনে ব্যাংকের কাছে বন্ধক দেয় এবং অনেক টাকা প্রমোদকর ফাঁকি দেয়। এ নিয়ে শুরু হয় মামলা-মোকদ্দমা। এতে জয়ী হল লাল মিয়া কিন্তু পরে তিনি আর হলটি চালু করেননি। ১৯৭৮ সাল পর্যন্ত এটি ব্যবহৃত হয় গোডাউন হিসেবে ওই বছরই লাল মিয়া হলটি বিক্রি করে দেন।

ঢাকার ইতিহাস ও সাংস্কৃতিক অঙ্গন থেকে এভাবেই 'প্যারাডাইস' প্রেক্ষাগৃহের বিলুপ্তির সঙ্গে অনেক চলচ্চিত্র স্মৃতিও হারিয়ে গেছে।[১১]

ব্রিটানিয়া

দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের সময় ঢাকার রমনা এলাকায় বর্তমানে জাতীয় গ্রন্থ ভবন ও টিসিবি ভবন সংলগ্ন পূর্বপ্রান্তে 'ব্রিটানিয়া' নামে একটি প্রেক্ষাগৃহ স্থাপিত হয়। মূলত এই হলে ইংরেজি ছবিই চলতো বেশি। ইংরেজি ভাষাভাষী, বিদেশী, অস্থানীয়, শিক্ষিত ও বিত্তবানরাই ছিল এ হলের দর্শক। পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগে 'ব্রিটানিয়া' বিলুপ্ত হয়ে যায়। এ হলে 'বুম টাউন', 'ক্যাপটেন ফ্রম ক্যাসেল', 'জুলিয়া মিস বিহেভস', 'বিয়ন্ড দি ফরেস্ট', 'সিটি অ্যাক্রস দি রিভার', 'অ্যাডভেঞ্চার অব ডেঞ্জারস', 'দি ব্যাড লর্ড বায়রণ' প্রভৃতি চলচ্চিত্র প্রদর্শিত হয়। বিশিষ্ট সাংবাদিক আবদুল মতিন ১৯৪০-৪১ খ্রিস্টাব্দে 'ব্রিটানিয়া' হলে ছবি দেখেছিলেন। তিনি লিখেছেন :

'বর্তমান গুলিস্তান এলাকার নিকটবর্তী গুদাম ঘরের মতো একটি অস্থায়ী বাড়িতে 'ব্রিটানিয়া' নামক একটি সিনেমা হাউজ ছিল। এ সিনেমা হাউজে আমার জীবনের সর্বপ্রথম ইংরেজি চলচ্চিত্র দেখলাম শেক্সপিয়রের বিখ্যাত 'হ্যামলেট' নাটক। হ্যামলেটের ভূমিকায় লরেন্স অলিভিয়ে এবং ওফেলিয়ার ভূমিকায় জিন সাইমনসের অভিনয় আমার মনে গভীর রেখাপাত করে। 'ব্রিটানিয়া সিনেমা হলের একটি অপ্রীতিকর ঘটনার কথা এখনো আমার মনে আছে। ছবির শেষে পর্দায় 'ইউনিয়ান জ্যাক' ভেসে উঠতো এবং ব্রিটেনের জাতীয় সঙ্গীত 'গড সেভ দি কিং' শোনা যেত। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের এই প্রতীক আমরা অত্যন্ত ঘৃণা করতাম। তখন সিনেমা হলের দর্শকদের অধিকাংশ ছিল ঢাকায় কর্মরত ব্রিটিশ নাগরিক। তারা আসন ছেড়ে দাঁড়িয়ে তাদের জাতীয় পতাকা ও সঙ্গীতের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শন করত। আমরা এক মুহূর্তও অপেক্ষা না করে বেরিয়ে যেতাম। ব্রিটিশ 'টমি'দের তা পছন্দ হয়নি। তাদের একজন আমাদের এক বন্ধুকে একদিন আক্রমণের চেষ্টা করে। তারপর থেকে আমরা খুব সতর্ক থাকতাম এবং ছবি শেষ হওয়া মাত্র সাবধানে হল থেকে বেরিয়ে পড়তাম।[১২]

অন্যান্য প্রেক্ষাগৃহ

ঢাকায় নিয়মিত প্রেক্ষাগৃহ চলুর সমসাময়িককালে অর্থাৎ এ শতকের বিশের দশকে চট্টগ্রামে 'সিনেমা প্যালেস' ও 'রঙ্গম' হল স্থাপিত হয়। ১৯২৯-৩০ সালের দিকে নারায়ণগঞ্জে প্রতিষ্ঠিত হয় 'বাণী সিনেমা'। ১৯৩৭ সালে এ হলের মালিকানা চলে যায় মোখলেসুর রহমান (কবি শামসুর রাহমানের পিতা) ও মির্জা ফকির মোহাম্মদের হাতে। তারা হলের নতুন নাম রাখেন 'ডায়মন্ড সিনেমা'। মোখলেসুর রহমান পরে তার এক ভাই আরিফুর রহমানের সঙ্গে ঢাকায় 'তাজমহল' প্রেক্ষাগৃহ বানান। ত্রিশের দশকের প্রথমদিকে ঢাকার সদরঘাট এলাকায় 'চিত্রালয়' নামে আরেকটি প্রেক্ষাগৃহ ছিল বলে জানা যায়। সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা' পত্রিকায় প্রচারিত বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায় ১৯৩৫ সালে এখানে 'পায়ের ধুলো', 'দিগদারী', 'স্কাই ডেভিলস' প্রভৃতি ছবি দেখানো হয়েছিল। চল্লিশ দশকের প্রথমদিকে ঢাকায় স্থাপিত হয় 'নাগরমহল' (চিত্রামহল') ও শেষের দিকে 'মায়া' ('স্টার') হল। ১৯৫৩ সালে ঢাকার রমনা এলাকায় ফজলে দোসানী প্রতিষ্ঠা করেন 'গুলিস্তান' প্রেক্ষাগৃহ [১৩] একই স্থানে পরে চালু হয় 'নাজ' হল।

নির্বাক চলচ্চিত্র নির্মাণ পর্ব (ব্রিটিশ যুগ)

ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণ প্রয়াস প্রসঙ্গে একটি কৌতূহলোদ্দীপক তথ্যের উল্লেখ করা প্রয়োজন তথ্যটি হচ্ছে ১৮৫৬ সালে ঢাকায় একটি প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণের ঘটনা এই তথ্যটি ছাপা হয়েছে কোলকাতার পত্রিকায় 'পাকিস্তানের স্টুডিও সংবাদ' শিরোনামে ঢাকা থেকে পাঠানো এক প্রতিবেদনে জনাব তহুর আহমেদ লিখেছেন :

'পূর্ববাংলা তথা পূর্ব পাকিস্তানে সর্বপ্রথম ছবি তোলা হয় ১৮৫৬ সালে। ছবিটি ছিল একটা ডকুমেন্টারি। এরপর ছবি তোলা হয় পুরো একশ' বছর পর ১৯৫৬ সালে। ছবির নাম 'মুখ ও মুখোশ' [১৪]

এই তথ্য অনুযায়ী ১৮৫৬ সালে অর্থাৎ সিপাহী বিদ্রোহের এক বছর আগে ঢাকায় ছবি তৈরি হয়। এখন প্রশ্ন হচ্ছে ছবিটি কী আদৌ 'চলচ্চিত্র' বা 'স্থিরচিত্র' ছিল? বিশ্ব চলচ্চিত্রের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, চলচ্চিত্র আবিষ্কার সম্পূর্ণ রূপ পায় ১৮৯০ সালের পর। কাজেই ওই সময়ের মধ্যে ঢাকায় চলচ্চিত্র নির্মাণের ঘটনা বিজ্ঞান ও ইতিহাসভিত্তিক নয়। তবে ওই সময় হয়তো কেউ ক্যামেরার সাহায্যে 'স্থিরচিত্র' তুলে থাকবেন। জনাব তহুর আহমেদের তথ্যে ছবির নির্মাতা এবং বিষয়বস্তু সম্পর্কেও আর অন্য কোনো উল্লেখ নেই।

এই প্রসঙ্গে উপমহাদেশে ফটোগ্রাফি বা ক্যামেরা চালু সম্পর্কে আলোকপাত করা যেতে পারে।

ফ্রান্সের নিসেফোর নিপকে ১৮১৬ সালে ফটোগ্রাফিক ইমেজ আবিষ্কার করেন। ১৮৩০ সালে ফক্স ট্যালবট আবিষ্কার করেন নেগেটিভ। ১৮৩৭ সালে লুই দ্যগুয়ের সার্থক ফটোগ্রাফি আবিষ্কার করেন আর উইলিয়াম ফিক্স গ্রিনি ১৮৪৬ সালে আবিষ্কার

করেন সেলুলয়েড ফিল্ম। কোলকাতা তথা উপমহাদেশের প্রথম ফটোগ্রাফার হচ্ছেন ফ্রান্সের এফএম মন্টেরো তিনি দ্যগুয়ের পদ্ধতিতে ছবি তোলেন ১৮৪৪ সালে ১৮৪৮ সালে কোলকাতায় স্ক্রানুজহোফার নামে এক ভদ্রলোক ফটোগ্রাফিক স্টুডিও খোলেন। এর দু'বছর পর বোম্বেতে স্থাপিত হয় আরেকটি ফটোগ্রাফিক স্টুডিও। ১৮৫৪ সালে বোম্বেতে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের প্রথম ফটোগ্রাফিক সোসাইটি। এদিকে ১৮৫৬ সালে কোলকাতায় স্থাপিত হয় 'বেঙ্গল ফটোগ্রাফিক সোসাইটি'। এ তথ্যের আলোকে অনুমান করা যায় যে, তখন হয়তো ঢাকায়ও কেউ ফটোগ্রাফি শিখে ছবি (স্থিরচিত্র) তুলে থাকবেন।

ঢাকায় ফটোগ্রাফি চর্চা উনিশ শতকেই শুরু হয় স্থানীয় বিদেশী, নবাব, জমিদার ও অভিজাত শ্রেণীর মধ্যে। মানিকগঞ্জের হীরালাল সেন ফটোগ্রাফি চর্চা করেছিলেন। ১৮৯০ সালে কোলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেছিলেন উন্নতমানের স্টুডিও। ১৯০১ সালের মধ্যে তিনি ছবি নির্মাণ করে বাঙালিদের মধ্যে পথিকৃৎ হয়ে আছেন। ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা আজাদ, খাজা আজমল, খাজা জহির প্রমুখ শিখেছিলেন ক্যামেরার কাজ।

ঢাকার প্রথম ছবি নির্মাণের উদ্যোক্তা হচ্ছেন নবাব পরিবারের সংস্কৃতিমনা কয়েকজন তরুণ। এই নবাব পরিবারে এ দেশীয় সংস্কৃতির বদলে উত্তর-ভারতীয় সংস্কৃতির প্রভাবই ছিল বেশি। বহুদিন বাংলাদেশে বসবাস করেও তারা বাংলা ভাষাকে গ্রহণ করতে পারেননি। পরিবারিক পর্যায়ে সাহিত্য, সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে উর্দুই ছিল একমাত্র মাধ্যম। আর শিক্ষার পর্যায়ে ছিল ইংরেজি।

নবাবদের খেয়াল বা শখের কমতি ছিল না। বিচিত্র খেয়ালি এ নবাবরাই ঢাকা প্রথম আরবি ঘোড়া আনেন। সাপ্তাহিক-বার্ষিক ঘোড় দৌড় প্রতিযোগিতা, ঘুড়ি উড়ানোর প্রতিযোগিতা, বুলবুলি পোষা, পায়রার লড়াই দেখার ব্যবস্থা করেন। অনুমান করা হয় ঢাকায় ছবি তৈরির প্রচেষ্টার ব্যাপারটাও ছিল নবাব পরিবারের একটা খেয়াল বা শখ।

শখই হোক বা আর যাই হোক, ঢাকায় প্রথম ছবি নির্মাণ প্রচেষ্টার জন্য নবাব পরিবারের তরুণরা সে সময় যে উদ্যোগ নিয়েছিলেন সেটা বাংলার মুসলমান সম্প্রদায়ের জন্য একটা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এটি এ দেশের ছায়াছবির ইতিহাসের জন্যও একটা গৌরবজনক মূল্যবান অধ্যায়।

নবাব পরিবারের যেসব সংস্কৃতিমনা তরুণ ফটোগ্রাফি চর্চা করেছিলেন তারাই এ শতকের বিশের দশকের শেষদিকে চলচ্চিত্র নির্মাণে উদ্যোগ নেন। এ উদ্দেশ্যে তারা গঠন করেন ঢাকা তথা বর্তমান বাংলাদেশের প্রথম প্রযোজনা প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ সোসাইটি'।

১৯২৫-২৬ সালের দিকে ঢাকা শহর থেকে পেশাদার থিয়েটার লোপ পেয়ে যায় চলচ্চিত্রের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় টিকতে না পেরে। লায়ন থিয়েটার পরিণত হয় নিয়মিত

সিনেমা হাউজে আরো তিনটি হলে লোকজন নিয়মিত সস্তায় ছবি দেখে চিত্তবিনোদনের সুযোগ লাভ করে। এ পরিবেশ-প্রতিবেশের মধ্যেই ঢাকায় প্রথম ছবি তৈরির প্রচেষ্টা চলে।

১৯২৭-২৮ সালে নবাব পরিবারের খাজা আজমল, খাজা আজাদ, খাজা আদেল, খাজা নসরুল্লাহ, খাজা জহির, জগন্নাথ কলেজের শরীরচর্চার প্রশিক্ষক ও নাট্য পরিচালক অম্বুজ প্রসন্ন গুপ্ত, আবদুস সোবহান এবং আরো কয়েকজন মিলে ছবি তৈরির সিদ্ধান্ত নেন। সিদ্ধান্ত নেন পূর্ণদৈর্ঘ্য ছবি নির্মাণের আগে তারা একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি বানাবেন এ পরিকল্পনা মোতাবেক টেস্ট ফিল্ম হিসেবে শুরু হয় স্বল্পদৈর্ঘ্য ছবির কাজ। ছবির নাম রাখা হয় 'সুকুমারী'। পরিচালক হন অম্বুজ গুপ্ত, চিত্রগ্রাহক খাজা আজাদ, নায়ক খাজা আদেল ও খাজা নসরুল্লাহ এবং নায়িকা বানানো হয় সুশ্রী তরুণ সোবহানকে দিলকুশা গার্ডেনে শুরু হয় পরীক্ষামূলক ছবির শুটিং। শুটিংয়ের সময় ছবিতে কোনো লাইট ব্যবহার করা হয়নি। দিনের বেলায় সূর্যের আলোতে পুরো ছবিটার শুটিং করা হয় পিচবোর্ডে সিগারেটের কাগজ দিয়ে আলোর 'এফেক্ট' তৈরি করা হয় শুটিংয়ের সময়। ফিল্মের অভাবে কোনো 'শট' দু'বার নেয়া হয়নি। এ ছবিটি তিন কি চার রিলের ছিল বলে জানা যায় 'সুকুমারী' নামের এ ছবিটি কোনো প্রেক্ষাগৃহে প্রদর্শিত হয়নি। নবাব পরিবারের মধ্যেই এটা দেখানো হতো। এ ছবির কাহিনী সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি তবে একটি হাস্যকর দৃশ্য ছিল এতে। এ ছবির সঙ্গে জড়িত খাজা জহিরের বর্ণনা মতে :

নায়িকা 'সুকুমারী' (আবদুস সোবহান) মাথায় শাড়ির আঁচল দিয়ে স্বামীর সঙ্গে যাচ্ছেন। এমন সময় অসাবধানতাবশত (নাকি অনভ্যাসবশত) হঠাৎ মাথার আঁচল সরে যায়। ফলে, ছোট ছোট চুলওয়ালা পুরুষের মাথা বেরিয়ে পড়ে। ফিল্মের অভাবে দৃশ্যটি আর দ্বিতীয়বার নেয়া হয়নি এবং শুটিংয়ের সময় ক্যামেরাও বন্ধ রাখা হয়নি। প্রজেক্টরে ফিল্ম চালানোর সময় যখন শাড়ির আঁচলে ঢাকা রমণীর মাথা হঠাৎ পুরুষের মাথা হয়ে গেছে তখন এ দৃশ্য দেখে ছবির নির্মাতারা যেমন আমোদ পেতেন তেমন যারা দেখতেন তারাও হেসে লুটোপুটি খেতেন। 'সুকুমারী'র একটি মাত্র প্রিন্ট করা হয়েছিল। ঢাকায় প্রথম ছবি নির্মাণ প্রয়াসের স্বাক্ষরবাহী এ ছবিটির প্রিন্ট হারিয়ে বা নষ্ট হয়ে গেছে।

সুকুমারী প্রসঙ্গে এসে যায় ছবির নায়িকার কথাও কারণ, এ ছবির 'নায়িকা' ছিলেন একজন পুরুষ, তিনি সৈয়দ আবদুস সোবহান। তার জন্ম ঢাকাতেই। তার পিতা সৈয়দ আবদুল ওহাব ছিলেন একজন সাব-রেজিস্ট্রারার। তিন ভাইয়ের মধ্যে জনাব সোবহান ছাত্রজীবন থেকেই জড়িত ছিলেন বিভিন্ন ক্রীড়া ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সঙ্গে এ সুবাদেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল নবাববাড়ির খাজা আজমল, খাজা আদেল, খাজা নসরুল্লাহ, খাজা আজাদ প্রমুখের সঙ্গে এ ঘনিষ্ঠতার সূত্র ধরেই সুশ্রী শিক্ষিত তরুণ আবদুস সোবহান 'সুকুমারী'তে নায়িকা হিসেবে অভিনয় করেন খাজা আদেল ও খাজা নসরুল্লাহর বিপরীতে। সামাজিক কারণে সে সময় ছবি বা নাটকে

কোনো ভদ্রঘরের মেয়ে অভিনয় করতে আসতো না ফলে তরুণ আবদুস সোবহানকেই সেদিন তরুণী সেজে অভিনয় করতে হয়েছিল।

অভিনয়পাগল এ তরুণ পরে বেঙ্গল সিভিল সার্ভিসে একজন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে যোগ দেন। পরে আর অভিনয়ের সঙ্গে সম্পর্ক রাখেননি এমনকি এ গ্রুপের পরবর্তী বৃহত্তর প্রচেষ্টা 'শেষ চুম্বন' ছবিতেও তিনি ছিলেন অনুপস্থিত।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর আবদুস সোবহান হন একমাত্র বাঙালি সিএসএস। পরে তিনি পাকিস্তান সরকারের বিভিন্ন উচ্চতর পদে চাকরি করেন। ১৯৭০ সালে জনাব সোবহান পাকিস্তান সরকারের পরিকল্পনা মন্ত্রণালয়ের সচিব হিসেবে চাকরি থেকে অবসর নেন। ১৯৭১ সালের পহেলা মে তারিখে তিনি মারা যান। তিনি হোটেল পূর্বাণীর একজন প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন।

স্বল্পদৈর্ঘ্যের 'সুকুমারী' ছিল উদ্যোক্তাদের হাত মসকে করার ছবি। এ ছবি নির্মাণে সাফল্য লাভের পরই নির্মাতারা উদ্যোগী হন পূর্ণাঙ্গ ছবি 'শেষ চুম্বন' ('দি লাস্ট কিস') তৈরিতে। এ ছবির পরিচালক ছিলেন অম্বুজ গুপ্ত। প্রথমে ছবির নায়ক নির্বাচিত করা হয় সুদর্শন খাজা নসরুল্লাহকে। কিন্তু পরে তিনি গররাজি হলে কাজী জালালউদ্দিনকে নেয়া হয় কিছুদিন শুটিং করার পর কাজী জালালও আর নায়ক থাকতে রাজি হলেন না। অগত্যা খাজা আজমলই হলেন ছবির নায়ক ছবির চিত্রগ্রহণের বেলায়ও এরূপ ক্যামেরাম্যান বদল ঘটে। প্রথমে ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শুরু করেন খাজা আজাদ। তিনি ফটোগ্রাফি অধ্যয়ন করেছিলেন। তার একটি প্যাথে ক্যামেরাও ছিল। ছবির প্রায় শেষ পর্যায়ে এসে খাজা আজাদ ব্যক্তিগত কাজে কোলকাতা চলে যান। এরপর ছবির বাকি অংশের চিত্রগ্রহণের দায়িত্ব নেন নায়ক খাজা আজমল নিজেই। তাকে সহায়তা করেন খাজা জহির সহকারী ক্যামেরাম্যানের দায়িত্ব ছাড়াও খাজা জহির ছবিতে নায়িকা লোলিটাকে অপহরণের দৃশ্যে অভিনয় করেন

ছবির নায়িকা ছিলেন লোলিটা। তাকে এবং ছবির আরেক অভিনেত্রী চারুবালাকে আনা হয় পতিতালয় থেকে অন্যান্য অভিনেত্রীর মধ্যে ছিলেন দেববালা ও হরিমতি। হরিমতি সম্পর্কে জানা যায় যে, তিনি ছিলেন সে সময়ে ঢাকার নামকরা বাঈজী। ছবিতে তিনি মেয়েদের নৃত্যদৃশ্যে গান গেয়েছিলেন। সাত দশমিক পাঁচ ল্যান্সওয়ালা হ্যান্ড ক্র্যাকিং বক্স ক্যামেরা দিয়ে এ ছবির শুটিং করা হয়। ছবির চিত্রগ্রহণ শুরু হয় ১৯২৯ সালের অক্টোবর মাসে প্রায় এক বছর লেগেছিল ছবির চিত্রগ্রহণের কাজ শেষ করতে। নবাবদের দিলকুশা গার্ডেনে, শাহবাগ, নীলক্ষেত বাগিচা এবং মতিঝিল এলাকায় নবাবদের ছবির চিত্রগ্রহণ করা হয় এ ছবির ব্যাপারে আজিমপুর এলাকায় নবাবদের বাগানে অস্থায়ী স্টুডিও স্থাপন করা হয়েছিল। ছবির সম্পাদনা ও প্রসেসিংয়ের কাজ হয় কোলকাতায় অম্বুজ গুপ্ত ও খাজা আজমল দুজনই ছবিটি সম্পাদনা করেন। নির্বাক এ ছবিটি বাংলা, উর্দু ও ইংরেজি ভাষায় সাব-টাইটেল করা হয় ইংরেজি ও বাংলা সাব-টাইটেল রচনা করেন অম্বুজ গুপ্ত এবং উর্দু সাব-টাইটেল

রচনা করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্দালিব সাদানী।

১২ রিলের এ নির্বাক ছবিটি তৈরি করতে প্রায় ১২ হাজার টাকা খরচ হয়েছিল। ১৯৩১ সালের শেষার্ধে ছবিটি ঢাকার তৎকালীন মুকুল হলে (বর্তমান আজাদ) মুক্তি দেয়া হয়। ছবিটির অত্যন্ত সাফল্যজনকভাবে এক মাসব্যাপী প্রদর্শনী চলে। উদ্বোধন করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার। তিনি ছবির দুই শিশুশিল্পী শাহেদ ও টুনটুনকে মেডেল দিয়েছিলেন। ছবির একটি মাত্র প্রিন্ট করা হয়েছিল। এ প্রিন্টটি বৃহত্তর পরিবেশনার জন্য আহসান মঞ্জিলের সৈয়দ সাহেবে আলম কোলকাতার অরোরা ফিল্ম কোম্পানির কাছে নিয়ে যান। সেখানে প্রিন্টটি অরোরা ফিল্ম কোম্পানির লোকেরা সুকৌশলে মাত্র এক হাজর টাকায় কিনে নেয়। এরপর থেকে প্রিন্টটির আর কোনো খোঁজ নেই।

'শেষ চুম্বন' বা 'দি লাস্ট কিস' ছবি সম্পর্কে গোছানো কিছু পাওয়া যা না। বিভিন্ন জনের সাক্ষাৎকার থেকে যা পাওয়া গেছে নিচে তা তুলে ধরা হলো :

খাজা মোহাম্মদ জহির (ছবির সহকারী চিত্রগ্রাহক ও অভিনেতা) : এক রাতে নায়ক আজমল তার স্ত্রী লোলিটাকে নিয়ে যাত্রা দেখতে যাওয়ার পথে জমিদার খাজা নসরুল্লাহর বাহিনী দ্বারা আক্রান্ত হন। পরে বহু খোঁজাখুঁজির পর নায়িকা লোলিটাকে জমিদার নসরুল্লাহর ঘরে পাওয়া যায়। সেখানে উভয়পক্ষের মধ্যে সংঘর্ষ বাঁধে ঘটনার অনিবার্য পরিণতিতে নায়ক-নায়িকা মারা যায়। ছবির আরেকটি দৃশ্যে খাজা মোহাম্মদ আদেল ও তার স্ত্রী চারুবালার শিশুপুত্র খাজা মোহাম্মদ শাহেদকে ডাকাতরূপী শৈলেন রায় (টোনাবাবু) চুরি করে নিয়ে যায়। খাজা আজমলের পরনে ছিল পাঞ্জাবি আর ধুতি। লোলিটার পরনে ছিল শাড়ি, আঁচলে চাবির গোছা।

খাজা মোহাম্মদ ইউসুফ রেজা (ছবির প্রত্যক্ষ দর্শক ও হকি ক্রীড়াবিদ) : এ ছবিতে বেশ্যা বাঈজীদের নিয়ে ধনীদের মধ্যে যে সংঘর্ষ দেখানো হয়েছে ওই সময় তা ছিল নিত্যনৈমিত্তিক ঘটনা। এ ছবির কাহিনী ছিল এক বাস্তব ঘটনারই রূপায়ণ।

খাজা মোহাম্মদ আহসান (অভিনেতা খাজা মোহাম্মদ আকমলের পুত্র) : এ ছবির কাহিনী ও স্থিরচিত্র নিয়ে ওই সময় একটি সুদৃশ্য বুকলেট প্রকাশ করা হয়েছিল। বোম্বে থেকে প্রকাশিত একটি পত্রিকায় ঢাকার এই প্রথম ছবি নির্মাণকে স্বাগত জানানো হয়েছিল। এ ছবিতে আমার আব্বা ডাকাতের চরিত্রে অভিনয় করেন আর সৈয়দ আলম অভিনয় করেন দারোগার চরিত্রে। ওই ছবির একটি দৃশ্যে নায়ক খাজা আজমল নায়িকা লোলিটার শাড়ি ধরে টেনে ইজি চেয়ারে নিজের কোলে বসিয়েছিলেন।

খাজা শাহেদ (অভিনেতা) : মাত্র তিন বছর বয়সের সময় আমি ওই ছবিতে অভিনয় করি। কাহিনীর পুরোটা মনে না থাকলেও এটুকু মনে আছে যে, ছবিটির কাহিনী আবর্তিত হয়েছিল দুই পরিবারের সংঘাতকে ঘিরে। একপক্ষে ছিলেন খাজা আদেল, তাঁর স্ত্রী চারুবালা এবং শিশুপুত্র খামি। অপরপক্ষে ছিলেন খাজা আজমল, তার স্ত্রী ও ছোট্ট মেয়ে টুনটুন। দুই পরিবারের দুই শিশুর মধ্যে স্বাভাবিক নির্মল সম্পর্ক গড়ে

ওঠে কিন্তু নানা ঘটনার আবর্তে দুই পরিবারের মধ্যে আসে বিচ্ছেদ। এই বিচ্ছেদ মুহূর্তে দুই শিশুশিল্পী পরস্পর পরস্পরকে চুম্বন করে। ছবিটির নাম তাই রাখা হয় 'শেষ চুম্বন' বা 'দি লাস্ট কিস'। এই ছবিতে খাজা আকমল, টোনাবাবু, খাজা নসরুল্লাহ ছিলেন মন্দ চরিত্রে। টোনাবাবু যখন আমাকে চুরি করে নিয়ে যাচ্ছিলেন, বাস্তবে তখন এত ভয় পেয়েছিলাম যে কেঁদে ফেলেছিলাম। এ ছবিতে আমার পিতা সেজেছিলেন খাজা মোহাম্মদ আদেল, পরে তিনি বাস্তবে আমার শ্বশুর হন। ছবিতে সাহেবে আলম ঘোড়ায় চড়েছিলেন হ্যাট মাথায় দিয়ে। এ ছবির প্রিমিয়ার শো হয়েছিল মুকুল হলে। উদ্বোধন করেছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক বিশিষ্ট ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার। তিনি বেবী টুনটুন ও আমাকে সোনার মেডেল উপহার দিয়েছিলেন ওই ছবিতে অভিনয়ের জন্য।

খাজা মোহাম্মদ আরিফ (খাজা আজমলের পুত্র) : ওই ছবির একটি দৃশ্যে একজন বামন নেচেছিল, তার ভূমিকা ছিল ভাঁড় হিসেবে।

নাজীর আহমদ (চলচ্চিত্র নির্মাতা, এফডিসি'র প্রথম অপারেটিভ ডাইরেক্টর) : আমি কোলকাতায় চল্লিশ দশকের প্রথম দিকে খাজা নসরুল্লাহর বাসায় ছবির কিছু অংশ দেখি। ওই অংশের নায়ক ছিলেন খাজা নসরুল্লাহ আর নায়িকা ছিলেন দেবী (প্রাথমিক পর্যায়ে ছবির নির্মাণ পর্বে খাজা নসরুল্লাহ নায়ক ছিলেন। পরে তিনি আর নায়ক হননি। খাজা আজমল হন নায়ক। প্রাথমিক পর্বে সেই চিত্রায়িত দৃশ্য সম্ভবত : খাজা নসরুল্লাহ সযত্নে রক্ষা করেছিলেন)।

'শেষ চুম্বন' বা 'দি লাস্ট কিস'-এর সংগঠনে ছিলেন : প্রযোজনা— ঢাকা ইস্ট বেঙ্গল সিনেমাটোগ্রাফ সোসাইটি। পরিচালনা— অম্বুজ গুপ্ত। চিত্রগ্রহণ— খাজা আজাদ। সম্পাদনা— অম্বুজ গুপ্ত ও খাজা আজমল। উর্দু সাব-টাইটেল রচনা— ডক্টর আন্দালিব সাদানী। অভিনয়— শৈলেন রায় (টোনাবাবু) (কেন্দ্রীয় চরিত্রে ডাকাত), খাজা আজমল (নায়ক), লোলিটা (নায়িকা), খাজা নসরুল্লাহ (প্রতি নায়ক), খাজা আদেল (জমিদার), খাজা আকমল (ডাকাত), খাজা জহির (ডাকাত), সৈয়দ সাহেবে আলম (পুলিশ), চারুবালা (খাজা আদিলের স্ত্রী), খাজা শাহেদ (শিশু অভিনেতা), বেবী টুনটুন (শিশু অভিনেত্রী), দেববালা, হরিমতি, ধীরেন মজুমদার, বেনু বন্দ্যোপাধ্যায়, ধীরেন ঘোষ প্রমুখ।

ঢাকার প্রথম ছবির পরিচালক অম্বুজ প্রসন্ন গুপ্তের জন্ম ঢাকাতে। তার পিতা বিপিন গুপ্ত ছিলেন এক্সাইজ সুপারিনটেনডেন্ট। তারা তিন ভাই, অপর দুই ভাই হচ্ছেন— সরোজ প্রসন্ন গুপ্ত ও নীরোজ প্রসন্ন গুপ্ত। সেকালের প্রখ্যাত হকি খেলোয়াড় পংকজ গুপ্ত ছিলেন তার চাচাতো ভাই। প্রথমে তাদের বাসা ছিল যোগীনগরে। পরে হাটখোলায় পিতার নিজের বাড়ি তৈরি হলে তারা সপরিবারে এখানে চলে আসেন। অম্বুজ গুপ্ত শৈশব থেকেই ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন এবং যৌবনে তৎকালীন ঢাকার একজন বিশিষ্ট ক্রীড়াবিদ, ক্রীড়া সংগঠক, নাট্য পরিচালক হিসেবে খ্যাতি অর্জন করেন। পরে

তিনি জগন্নাথ কলেজে শরীরচর্চার প্রশিক্ষক হিসেবে যোগ দেন এবং ওয়ারি ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক হন।

১৯২৫-২৬ সালে তার পরিচালনায় র‍্যাঙ্কিন স্ট্রিটের বিহারী ভবনে 'সীতা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এরপর নবাব স্ট্রিটের এক বাড়িতে হয় 'আলমগীর' নাটক। ওয়ারিতে প্রথম ঘূর্ণায়মান মঞ্চ স্থাপিত হলে 'পতিব্রতা' নাটক মঞ্চস্থ হয়। এ নাটকের সঙ্গেও তিনি জড়িত ছিলেন। খেলা এবং নাটকের সূত্রেই তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক গড়ে ওঠে নবাব বাড়ির খাজা আজমল, খাজা আজাদ, খাজা আকমল, খাজা নসরুল্লাহ, খাজা জহিরের সঙ্গে। এ সম্পর্কের ফলশ্রুতিতেই তার পরিচালনায় তৈরি হয় 'সুকুমারী' ও 'দি লাস্ট কিস' ছবি দুটি। '৪০ এর দশকের প্রথমদিকে তিনি 'ইউনিভার্সোল ফিল্ম' গঠন করেন এর অফিস ছিল পাটুয়াটুলীতে। সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর তিনি কোলকাতায় চলে যান এবং সেখানেই মারা যান। তার বাড়ি ছিল দক্ষিণ বিক্রমপুরের মগর গ্রামে

'সুকুমারী' ও 'দিস লাস্ট কিস' ছবির অন্যতম সংগঠক ছিলেন ঢাকার নবাব পরিবারের খাজা আজমল। তিনি 'দি লাস্ট কিস'-এর নায়কও ছিলেন। এছাড়া জড়িত ছিলেন ছবির চিত্রগ্রহণ এবং সম্পাদনার সঙ্গে তার বড় ভাই খাজা আদেলও এ ছবিতে অভিনয় করেন।

খাজা আজমল ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমনা ছিলেন। তৎকালীন হিন্দু-মুসলমান ক্রীড়া ও সংস্কৃতিমনাদের সঙ্গে তার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল। তিনি ছিলেন একজন কৃতি হকি ও টেবিল টেনিস খেলোয়াড়। তিনি বহুদিন ওয়ারি ক্লাব ও ঢাকা স্পোর্টস এসোসিয়েশনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন। তিনি প্রথম ঢাকায় মোটরগাড়ি আনেন এবং ঢাকায় আগত প্রথম বিমানের অন্যতম আরোহীও ছিলেন তিনি।

পাকিস্তান হওয়ার পর ১৯৪৯ সালে তিনি ঢাকা বেতারে যোগ দেন অনুষ্ঠান ঘোষক হিসেবে। তিনি বেতারের অনেক নাটকেও অংশ নেন। ১৯৪৪ সালে প্রথম উর্দু নাটকে তিনি অভিনয় করেন খাজা আজমল ১৯৭১ সালের ১৭ ডিসেম্বরে নিহত হন সাভারে তিনি ছিলেন ১৭/১৮ জন ছেলেমেয়ের জনক।

'দি লাস্ট কিস' ছবির নায়িকা লোলিটার জীবনবৃত্তান্ত বিশেষ কিছু জানা যায়নি। যদ্দুর জানা যায়, লোলিটার আসল নাম ছিল বুড়ী। ছবির প্রয়োজনে তখন কোনো ভদ্রঘরের মেয়েদের পাওয়া যেতো না বলে বাদামতলীর পতিতালয় থেকে তাকে রুপালী আলোর জগতে আনা হয় এবং নতুন নাম দেয়া হয় লোলিটা। তখন তার বয়স ছিল ১৪ বছর। ছবির কাজ শেষ হওয়ার পর লোলিটা আবার পূর্ব পেশায় ফিরে যান ঢাকার প্রথম ছবির নায়িকা এমনিভাবেই একদিন হারিয়ে যান লোকচক্ষুর অন্তরালে।

ওই ছবির নায়িকা এবং অন্যান্য অভিনেত্রীদের যোগাড় করা হয় পতিতালয় বা নাচ-গানের আসর থেকে। কারণ, সে সময় ছবিতে কোনো পুরুষেরই অভিনয় করার ব্যাপারটা ছিল রীতিমতো গর্হিত কাজ আর মেয়েদের অভিনয় করার কথাতো অকল্পনীয়। ছবির সহ-নায়িকা চারুবালা রায়কে আনা হয় কুমারটুলী পতিতালয় থেকে।

আর দেববালাকে জিন্দাবাহার লেন থেকে। নায়িকা লোলিটার মতো এরাও হারিয়ে গেছেন লোকচক্ষুর অন্তরালেই

ছবির আরেক অভিনেত্রী হরিমতি ছিলেন ঢাকার নামকরা বাঈজী। তিনি ছবিতে মেয়েদের নৃত্যদৃশ্যের সঙ্গে গান গেয়েছিলেন। অজিতকৃষ্ণ বসু, পরিবেশিত এক তথ্যে (ঢাকার স্মৃতি : বুড়িগঙ্গার তীরে, ভারত বিচিত্রা, জুলাই, ১৯৮০) তার সম্পর্কে জানা যায় :

সেকালের ঢাকায় হরিমতি নামে একজন অতি সুকণ্ঠী জনপ্রিয় গায়িকা ছিলেন গ্রামোফোন (হিজ মাস্টার ভয়েজ এবং টুইন মার্কা লেবেলযুক্ত) রেকর্ডে নামকরা শিল্পী। তিনি ৭-৮টি নামে গানে কণ্ঠ দিতেন বলে জানা যায়।

কাজী নজরুল ইসলাম সাহেবের রচিত এবং সুর দেয়া গান রেকর্ডে গেয়ে হরিমতি বাজার মাত করেছিলেন, বিশেষ করে ঢাকা শহরের। গানখানির সুর (কথা) এই রকম:

ঝরা ফুল দলে কে অতিথি
সাঁঝের বেলা এলে কানন-বীথি'

এ গানের রেকর্ডের উল্টো পিঠে হরিমতি গেয়েছিলেন কাজী নজরুল ইসলামের আরেকখানা চটুল ঢঙের গান যার সঙ্গে চটুল ঢঙের মনমাতানো অর্কেস্ট্রা। গানটি ছিল:

কে নিবি ফুল, কে নিবি ফুল?
চামেলী যুঁথী, বেলী-মালতী,
চাঁপা গোলাপ বকুল।

আমার যৌবন বাগানে,
হাওয়া লেগেছে ফুল জাগানে,
চলে যেতে ঢলে পড়ি,
খুলে পড়ে এলো চুল।'

হরিমতি পরে কোলকাতায় চলে যান। তিনি সেখানে প্রথম দিককার সবাক বাংলা ছবির নায়ক-গায়ক হীরেন বসুর সঙ্গে কয়েকটি গানের রেকর্ডে কণ্ঠ দেন। হরিমতির জন্ম কোলকাতায়। কৈশোরে বিধবা হয়ে তিনি ঢাকায় পালিয়ে এসেছিলেন। তার ছোট বোন রাজবালাও ছিলেন বাঈজী। এই রাজবালার মেয়েই ইন্দুবালা। হরিমতির মেয়ে রেনুবালা নর্তকী-নায়িকা হিসেবে কোলকাতার মঞ্চ ও চলচ্চিত্রে নাম করেন।

তথ্য নির্দেশ :

১. মির্জা তারেকুল কাদের, বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প, ১৯৯৩, ঢাকা, পৃ. ৩৯৩।
২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯৪।
৩. রণেন কুশারীর সাক্ষাৎকার, এপ্রিল, ১৯৮৭।
৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৬-৭
৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৭।

৬. সত্যেন সেন : শহরের ইতিকথা, ১৯৭৪, ঢাকা, ২, ৩০৪ ।
৭. অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, পৃ. ৭ ।
৮. প্রাগুক্ত ।
৯. সাঈদ আহমদ, লায়ন সিনেমা ও সেকালের দর্শক, শৈলী, ১৬ আগস্ট, ১৯৭৭, ঢাকা, পৃ. ৪ ।
১০. অনুপম হয়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭ ।
১১. অনুপম হয়াৎ, কেউ জানে কেউ জানে না, চিত্রালী, ২৮ এপ্রিল, ১৯৯৫, ঢাকা ।
১২. আবদুল মতিন, পাঁচ অধ্যায়, ১৯৯৪, ঢাকা, পৃ. ৮৩-৮৪ ।
১৩. অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, পৃ. ৮ ।
১৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৯ ।

তৃতীয় অধ্যায়

সবাক চলচ্চিত্র নির্মাণ পর্ব (দেশ বিভাগোত্তর)

১৯৪৭ সালে পাকিস্তান হওয়ার পর ঢাকা হয় পূর্ববঙ্গ প্রদেশের রাজধানী। রাজনৈতিক কারণে ঢাকার গুরুত্ব বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে এখানকার শিল্প সংস্কৃতির অঙ্গন সরব হয়ে ওঠে নানা কর্মকাণ্ডে। এ সময় এখানেও ছবি তৈরির কথা ভাবা হয় কোলকাতা, বোম্বে বা অন্যান্য স্থানে যেসব বাঙালি মুসলমান চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতিকর্মী ছিলেন তারা ঢাকায় আসার কথা ভাবতে শুরু করেন। এখানকার সংস্কৃতিকর্মীরাও চলচ্চিত্র নির্মাণের কথা ভাবেন। কিন্তু এক্ষেত্রে প্রধান বাঁধা হয়ে দাঁড়ায় ছবি করার মতো কোনো স্টুডিও না থাকা।

ইন আওয়ার মিডস্ট : প্রথম তথ্যচিত্র

দেশ বিভাগের উন্মাদনা, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রশাসনিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পুনর্বাসনের হৈ চৈ'র মধ্যে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে ঢাকা সফরে আসেন। এখানে তার ১০ দিন অবস্থানের ওপর একটি তথ্যচিত্র তৈরি করতে হবে। কিন্তু তখন সরকারের ছবি তৈরির মতো সাজ-সরঞ্জাম-কুশলী-স্টুডিও নেই। এ অবস্থায় তথ্যচিত্র নির্মাণের দায়িত্ব দেয়া হয় ঢাকা বেতারকর্মী নাজীর আহমদের ওপর নাজীর আহমদ কোলকাতা বেতারে থাকার সময় ওখানে নির্মিত বিভিন্ন তথ্যচিত্র ও সংবাদচিত্রের বাংলা ধারা বিবরণীতে কণ্ঠ দিতেন। এ সুবাদে তিনি ওখানকার অরোরা স্টুডিওতে চলচ্চিত্র নির্মাণ বিষয়ে অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করেন। এ কারণেই মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ওপর তথ্যচিত্র নির্মাণের দায়িত্ব নাজীর আহমদকে দেয়া হয়। তিনি পূর্ব পরিচয়ের সূত্র ধরে কোলকাতায় অরোরা ফিল্ম স্টুডিও থেকে যন্ত্রপাতিসহ একজন অভিজ্ঞ ক্যামেরাম্যান এনে জিন্নাহর ১০ দিন অবস্থানের ওপর একটি তথ্যচিত্র নির্মাণ করেন ছবির প্রসেস করা হয় কোলকাতায়। সম্পাদনার কাজ ও ধারা বর্ণনা ছিল নাজীর আহমদের। বাংলা, ইংরেজি ও উর্দু ধারা বর্ণনা সম্বলিত এ তথ্যচিত্রটির নাম দেয়া হয় 'ইন আওয়ার মিডস্ট' বা 'পূর্ব পাকিস্তানে ১০ দিন'। ছবিটি মুক্তি দেয়া হয় ১৯৪৮ সালের এপ্রিল-মে সময়ের মধ্যে [১] এটিই পূর্ব পাকিস্তানে নির্মিত প্রথম ছবি।

ফিল্ম স্টুডিও-ল্যাবরেটরি স্থাপনের প্রচেষ্টা

বেসরকারি উদ্যোগ :

চলচ্চিত্র তৈরি করতে হলে প্রাথমিক প্রয়োজন হচ্ছে স্টুডিও এবং ল্যাবরেটরি।

১৮৯৮ সাল থেকে ছবি প্রদর্শিত হলেও ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত এখানে স্টুডিও বা ল্যাবরেটরি স্থাপনের কথা চিন্তা করা হয়নি '৪৭-এ পাকিস্তান হওয়ার পর এ ব্যাপারে অনেকেই চিন্তা-ভাবনা শুরু করেন।

কোলকাতা থেকে তৎকালীন সময়ে প্রকাশিত 'সাপ্তাহিক বেগম' পত্রিকায় ১৯৪৮ সালের ২৭ জুন এ ব্যাপারে একটি সংবাদ বের হয়। সংবাদটি ছিল : 'পূর্ব পাকিস্তানে আধা সরকারি ফিল্ম স্টুডিও স্থাপনের সিদ্ধান্ত।'

এ সংবাদ প্রকাশ হওয়ার মাত্র ছ'মাস পরই ১৯৪৯ সালের জানুয়ারি মাসে পূর্ব পাকিস্তানে প্রথম স্টুডিওর ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেন ক্যাপটেন এস এ এইচ জায়েদী। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন তৎকালীন প্রাদেশিক গভর্নর স্যার ফ্রেডারিক বর্ন পরে আর এ স্টুডিওর কাজ এগোয়নি। ১৯৫১ সালে ঢাকায় 'ন্যাশনাল স্টুডিও অ্যান্ড সিনে ল্যাবরেটরি' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয় বলে জানা যায়। তবে এর কার্যক্রম আর এগোয়নি ১৯৫৩ সালে জে. আর্থার র‍্যাংক কোম্পানির পরিচালক চট্টগ্রাম ও কক্সবাজারে স্টুডিও স্থাপনের চেষ্টা চালান। কিন্তু তৎকালীন সরকার তাকে অনুমোদন দেয়নি . ওই বছরেই চট্টগ্রামের ব্যবসায়ী তারেক আহমদ চৌধুরী 'হনিউড' নামে একটি স্টুডিও স্থাপনের কথা ঘোষণা করেন। কিন্তু সরকারি অনুমোদন পেতে সময় লেগে যায় ৪ বছর। ফলে আর স্টুডিও স্থাপন করা হয়নি। ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে 'কোবাদ অ্যান্ড কোম্পানি'কে সরকার চট্টগ্রামে স্টুডিও স্থাপনের অনুমতি দেয়। কিন্তু পরে সেটিও আর হয়নি। চট্টগ্রামে 'আল হেলাল স্টুডিও' নামে আরেকটি প্রতিষ্ঠানেরও জন্ম হয়েছিল।

সদ্য স্বাধীন দেশের রাজধানী ঢাকায় কেন ফিল্ম স্টুডিও হয়নি এর কারণ সম্পর্কে জানা যায় ১৯৫৩ সালের ১৩ জুন সাপ্তাহিক 'ইনসাফ' পত্রিকায় প্রকাশিত একটি নিবন্ধ থেকে 'পাকিস্তানের চলচ্চিত্র শিল্পের ভবিষ্যৎ' শিরোনামে প্রকাশিত উক্ত নিবন্ধে ইবনে সেরাজ লিখেছেন :

... এখানকার অধিকাংশ বড় পরিবেশকরাই ভারতীয় না হয় ভারতীয় মূলধনপুষ্ট। তাই এখানে স্টুডিও না হলে তাদের লাভ দ্বিবিধ। প্রথমত, এতে মূলধন খাটে কম, আর বিশেষ করে পাকিস্তানি জনগণের পকেট থেকে লাখ লাখ টাকা চলে যায় ভারতে কারণ ভারতীয় ছবির চাহিদা স্বভাবতই এখানে বেশি। সুতরাং পূর্ব পাকিস্তানে স্টুডিও স্থাপন করা হয়ে উঠলো না...।

সরকারি উদ্যোগ

মাসিক 'সিনেমা'র ১৯৫২ সালের আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সংখ্যায় প্রকাশিত একটি সংবাদ থেকে জানা যায় যে, জনাব এফ করিম সিনেমাটোগ্রাফির ওপর প্রশিক্ষণ নিয়ে কাশ্মীর দপ্তরে যোগদান করেছেন এবং সরকারি স্টুডিও গঠনের কথা চিন্তা করেছেন।

পাকিস্তানের লাহোরে বেসরকারি উদ্যোগে চলচ্চিত্র স্টুডিও থাকলেও সরকারি পর্যায়ে কোনো স্টুডিও ছিল না। ১৯৪৯ সালে পাকিস্তান সরকার ব্রিটিশ মুভিটোনের সঙ্গে

এক চুক্তি করেন। এ চুক্তি অনুযায়ী পাকিস্তান থেকে শুটিং করা তথ্যচিত্র, সংবাদচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র ওখানে প্রসেস করার জন্য পাঠানো হয়। ঢাকার নাজীর আহমদ তখন কাজ করেন বিবিসি'তে তিনি ওখানে পাকিস্তান ও ব্রিটিশ মুভিটোনের সঙ্গে সমন্বয়কারী হিসেবেও কাজ করেন। ব্রিটিশ মুভিটোনের বিল ময়লার কলম্বো প্ল্যানের অধীনে পাকিস্তানে আসেন সরকারের চলচ্চিত্র উপদেষ্টা হিসেবে। বিল ময়লারের উদ্যোগেই জন্ম হয় পাকিস্তান সরকারের চলচ্চিত্র ও প্রকাশন দপ্তর। এ সময় পূর্ব বাংলার মুখ্যমন্ত্রী নূরুল আমীন লন্ডন গিয়ে ব্রিটিশ মুভিটোন স্টুডিও পরিদর্শনে যান। তিনি ঢাকায়ও একটি চলচ্চিত্র স্টুডিও স্থাপনের ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন এবং নাজীর আহমদকে বলেন, দেশে ফেরার সময় ক্যামেরা নিয়ে যেতে। নূরুল আমীনের কথামতো আহমদ পরে একটি অ্যারিফ্লেক্স ক্যামেরা পাঠান তারই নামে। লন্ডন থেকে দেশে ফিরে নাজীর আহমদ যোগ দেন জনসংযোগ বিভাগের উপ-পরিচালক হিসেবে। আর ওই ক্যামেরা চালানোর জন্য লাহোর থেকে আনা হয় ইকবাল মির্জাকে। এ ক্যামেরা দিয়েই প্রাথমিকভাবে শুরু হয় 'সালামত' নামে একটি প্রামাণ্যচিত্রের কাজ 'সালামত' মুক্তি পায় ১৯৫৪ সালে। 'সালামত'-এর সাফল্য একটি পূর্ণাঙ্গ স্টুডিও স্থাপনের পথকে সামনে এগিয়ে নিয়ে যায়। এ ছবির কারণে স্টুডিও স্থাপনের জন্য সরকার থেকে ১ লাখ ৩৬ হাজার টাকা অনুমোদন পাওয়া যায়। ইতোমধ্যেই '৫৪ সালের নির্বাচন এসে যায়। ওই নির্বাচনে নূরুল আমীন হেরে যান। প্রাদেশিক গভর্নর ইস্কান্দার মির্জা ও চিফ সেক্রেটারি এনএম খানের সহায়তায় ওই টাকায় স্টুডিও স্থাপনের যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। তেজগাঁওস্থ বিজি প্রেসের ভেতরে একটি খালি ভবনে স্থাপন করা হয় অস্থায়ী স্টুডিও। বসানো হয় ল্যাব, প্রিন্টিং মেশিন, রেকর্ডিং ও প্রজেকশন রুম। জনসংযোগ দপ্তরের অধীনে চলচ্চিত্র বিভাগের কাজ এখান থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হয় ১৯৫৫ সালের ১৯ জুন। নবগঠিত চলচ্চিত্র বিভাগের প্রধান হন নাজীর আহমদ। এতে যোগ দেন আজাদ খান (চিত্রগ্রাহক), কাজী গোলাম আম্বিয়া (কুশলী), মোহসিন (শব্দগ্রাহক), কাসেম চিস্তি (প্রসেস), কায়সার রিজভী, আশুতোষ ঘোষ (সম্পাদক), এএমএ লালানি (কুশলী), একে কোরেশী (শব্দগ্রাহক), একেএম লুৎফর রহমান (শিক্ষানবিশ চিত্রগ্রাহক), শিশির সরকার (বাণিজ্যিক ব্যবস্থাপক) প্রমুখ। পরে এ বিভাগে যোগ দেন বেবী ইসলাম (চিত্রগ্রাহক), বদরুদ্দীন (শিল্প নির্দেশক), ইউসুফ আলী খান খোকা (প্রিন্টিং ও প্রসেস) প্রমুখ। ১৯৫৭ সালে এফডিসি প্রতিষ্ঠিত হলে পরে তারা সবাই এতে যোগ দেন।

এই বিভাগ থেকে সরকারি সংবাদচিত্র ও প্রচারচিত্র নির্মাণের পাশাপাশি শুরু হয় প্রামাণ্যচিত্র নির্মাণও। প্রাথমিক পর্যায়ে এই বিভাগের সঙ্গে নানাভাবে জড়িত হন শিল্পী জয়নুল আবেদীন, ফতেহ লোহানী, নূরুল ইসলাম (পরে বিবিসি'তে), শামসুল হুদা চৌধুরী (বেতার কর্মী, রাজনীতিবিদ ও পরে মন্ত্রী), সৈয়দ নুরুদ্দিন (সাংবাদিক-সাহিত্যিক), আবদুল আহাদ (সুরকার) প্রমুখ।

নতুন ফিল্ম স্টুডিও থেকে বেশকিছু তথ্যচিত্র ও প্রামাণ্যচিত্র তৈরি হয়। এসবের মধ্যে ছিল 'চাকা' (১৯৫৫) প্রভৃতি। ১৯৫৬ সালে এখান থেকে তৈরি হয় ঘানি মার্কা সরষের তেলের ওপর বিজ্ঞাপনচিত্র 'ভুল কোথায়' নামে, রামগুপ্তের পরিচালনায়

১৯৫৬ সালে সরকার চলচ্চিত্র নির্মাণের ৫ বছর মেয়াদি একটি পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করেন।

বিজি প্রেস এলাকায় স্থাপিত স্টুডিওটি ছিল খুবই সংকীর্ণ পরিসরের। পরে তেজগাঁওয়ের সিএসডি গুদামের পাশে রেললাইনের পূর্ব ধারে পূর্ণাঙ্গ স্টুডিওর জন্য বৃহত্তর জায়গা নেয়া হয়। এখানেই বর্তমানের এফডিসি স্থাপিত হয় ১৯৫৭ সালে। আগে এ স্থানে ছিল সাপ, জোঁক আকীর্ণ এক বিরাট জঙ্গল। নতুন স্টুডিওর জন্য ডিজাইন করা হয় কিছুটা ব্রিটিশ মুভিটোনের আদলে। ডিজাইন তৈরি করেন সরকারের প্রধান স্থপতি ম্যাকোনেল

সালামত

১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গে নির্মিত তথ্যচিত্র 'ইন আওয়ার মিডস্ট'-এর পর আরেকটি উল্লেখযোগ্য ছবি (প্রামাণ্যচিত্র) হচ্ছে 'সালামত' (১৯৫৪)। সরকারি প্রচার দপ্তর থেকে নির্মিত এ প্রামাণ্যচিত্রটির কাহিনীকার, সংলাপকার, চিত্রনাট্যকার, পরিচালক ও সম্পাদক ছিলেন নাজীর আহমদ। চিত্রগ্রাহক ছিলেন ইকবাল মির্জা আর তার সহকারী ছিলেন হাবিব বারকী। দৃশ্য পরিকল্পক ছিলেন সৈয়দ নুরুদ্দিন। ছবির সুরকার ছিলেন আবদুল আহাদ, তিনি পরিচালক নাজীর আহমদকে বিভিন্নভাবে সহায়তাও করেন।

সালামত নামে একজন ওস্তাগার ছিলেন নাজীর আহমদের বাড়িতে। বয়সের ভারে কুঁজো। এই সালামতের জীবনে কত বসন্ত এসেছে আর গেছে। ইট-সুরকি-চুন-বালু দিয়ে কত লোকের সে দালান-কোঠা গড়েছে, কিন্তু তার নিজের দালান-কোঠা হয়নি। সে দেখছে ঢাকা শহরের উত্থান-পতন, পুরনো ঢাকা, সদরঘাটের ঘিঞ্জি-গলি, পলেস্তারা খসা বাড়িঘর ছাপিয়ে মানুষ ছুটেছে নতুন এলাকা রমনা-সেগুনবাগিচা-আজিমপুরের দিকে। বাড়ছে শহর, উঠছে নিত্যনতুন দালান-কোঠা, গড়ে উঠছে রাজধানী শহর। সালামত এসবের সাক্ষী।

সালামতের দৃষ্টিতে নতুন নির্মীয়মাণ ঢাকা শহর ছিল এ ছবির বিষয়। 'সালামত' সব মহলে প্রচুর প্রশংসা পায়। 'সালামত'-এর দুটো ভার্সন ছিল— একটি এক হাজার ফুটের আরেকটি চার হাজার ফুটের।

'সালামত' সম্পর্কে সৈয়দ রেদওয়ানুর রহমান ১৩৬০ বঙ্গাব্দের ১২ আশ্বিন তারিখের 'দৈনিক সংবাদ' পত্রিকায় যে আলোচনা করেছিলেন, নিচে তার অংশবিশেষ তুলে ধরা হলো :

'শুধুমাত্র' ইটের পাঁজরাকে অবলম্বন করে প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করা অত্যন্ত কঠিন ব্যাপার। অথচ নাজীর আহমদের সুদক্ষ পরিচালনায় এই ইটের কাহিনী অমর প্রাণের

কাহিনী হিসেবে পূর্ব পাকিস্তানের চলচ্চিত্র জগতের ইতিহাসে লেখা থাকবে ঢাকায় যেখানে চলচ্চিত্র গ্রহণ উপযোগী একান্ত অত্যাবশ্যকীয় যন্ত্রপাতির নামগন্ধ নেই, সেখানে এমনি একটি প্রথম শ্রেণীর প্রামাণ্যচিত্র তৈরি করতে জনাব আহমদ যে দক্ষতা ও দুঃসাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন তার জন্য অভিনন্দন জানাচ্ছি। ... ক্যামেরার চোখে সেই নির্বাক ও পাষাণ ইমারতকে সুন্দরী ছন্দোবতী করে তোলার জন্য জনাব নাজীর আহমদ কর্তৃক গৃহীত প্রত্যেকটি দৃশ্য তার উঁচু দরের শিল্পীমনের পরিচায়ক। 'সালামত'-এর দৃশ্য পরিচালনা করেছেন সৈয়দ নুরুদ্দিন। সুদক্ষ কারিগরের অভিজ্ঞ নজরে যেমন একটি ইমারত গড়ে উঠেছে, তেমনি জনাব নুরুদ্দিনের দৃশ্য পরিচালনা ছবিটিকে করে তুলেছে সাবলীল ও প্রাণবন্ত। নাজীর আহমদের জোরালো অপূর্ব কণ্ঠধারা বিবরণী শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল যেন পাষাণ ইমারতের বুকে ভাষা ফুটেছে ঢাকার সঙ্গে প্রদেশবাসী তথা গোটা পাকিস্তানের অধিবাসীদের সঙ্গে বাস্তব পরিচয় ঘটানোর জন্য ঢাকার সুপ্রসিদ্ধ ছাদপেটা গান 'দে কনইয়া লাল বসন আমার হাতে দে' এবং 'ঢাকা থেকে আইন্যা দিও আবের চিরুণী' গান দুটির সুর সংযোজনা করে সত্যি 'সালামত'কে আকর্ষণীয় করে তোলা হয়েছে। দু'আনা দামের বেহালা বাদকের সঙ্গে ঢাকার আবাল-বৃদ্ধ-জনতা সকলেরই রয়েছে ঘনিষ্ঠ পরিচয়। 'সালামত' তারই সুর মূর্ছনায় দর্শক মাত্রকে অভিভূত করে তোলে। সঙ্গীত অংশে সার্থকতার জন্য আবদুল আহাদ ধন্যবাদার্হ। ... ছবিটির 'মন্টাজ'ও 'ডিজলভড'-এর কাজ বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। ক্যামেরাম্যান হিসেবে জনাব ইকবাল মির্জা খুবই দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। এক কথায় সালামত একটি আদর্শ প্রামাণ্যচিত্র। শুধু পূর্ব পাকিস্তানে কেন, পাকিস্তান 'সালামত'-এর জন্য গৌরব করতে পারে।'

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব

১৯৫২ সালের রক্তাক্ত ভাষা আন্দোলন তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের শিল্প, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনে এক বিরাট প্রভাব ফেলে। মূলত ভাষা অন্দোলনের সূত্রপাত ঘটে '৪৭ সালের আগস্ট মাসে পাকিস্তান সৃষ্টির আগে থেকেই। দেশ বিভাগের আগেই শোনা যায় যে, নতুন দেশ পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে। পাকিস্তান হওয়ার পর রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি আরও গুরুত্ব পায়। সংখ্যাগরিষ্ঠ পূর্ব পাকিস্তানিদের মাতৃভাষা উপেক্ষিত হয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে। এরই প্রতিবাদে সোচ্চার হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র, শিক্ষক ও সচেতন নাগরিক। ১৯৪৮ সাল থেকে শুরু হয় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার আন্দোলন। এ আন্দোলন শোকাবহ ঘটনায় রূপ নেয় ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। পুলিশের গুলিতে শহীদ হয় কয়েকজন। এ বিরুদ্ধ পরিবেশে সচেতন শিল্পী, সাহিত্যিক, সংস্কৃতিকর্মীরাও বিভিন্ন মাধ্যমে কাজ করতে থাকেন। এর ঢেউ লাগে চলচ্চিত্রাঙ্গনেও। নিহত শহীদানের স্মরণে প্রদেশের প্রেক্ষাগৃহগুলোও বন্ধ রাখা হয়।

একটি চ্যালেঞ্জ

১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাসে অর্থাৎ ভাষা আন্দোলনের এক বছর পর ঢাকার সচিবালয়ে পূর্ববঙ্গ সরকারের পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ডক্টর আবদুস সাদেক স্থানীয় সংস্কৃতিসেবী, চলচ্চিত্র পরিবেশক ও প্রদর্শকদের এক সভা আহ্বান করেন। ড. সাদেক পরিসংখ্যানের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বলে পশ্চিম পাকিস্তানি শোষকদের মনোভাব ভালোভাবে জানতেন। তিনি উক্ত সভায় পূর্ববঙ্গে অনগ্রসরতার কারণ তুলে ধরে তার সমাধানেরও ইঙ্গিত দেন পূর্ববঙ্গকে স্বাবলম্বী করার জন্যই তিনি প্রদেশে চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে তোলার আহ্বান জানান উক্ত বৈঠকে। ওই বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আবদুল জব্বার খান, নূরুজ্জামান, ফজলে দোসানী প্রমুখ। ড. সাদেক ছিলেন মনেপ্রাণে একজন বাঙালি। তিনি প্রদেশের ৯২টি প্রেক্ষাগৃহে বিদেশী ছবির বদলে যাতে স্থানীয় ছবি চলে সে জন্য ছবি তৈরির কথা বলেন। ডক্টর সাদেকের এ বক্তব্যের পর অবাঙালি চিত্রব্যবসায়ী ফজলে দোসানী বললেন যে, 'এখানকার আবহাওয়া খারাপ, আর্দ্রতা বেশি। কাজেই এখানে ছবি তৈরি সম্ভব নয়।' দোসানীর এ মন্তব্যের জবাবে আবদুল জব্বার খান চ্যালেঞ্জ করে বললেন, *কোলকাতায় যদি ছবি হতে পারে তবে ঢাকায় হবে না কেন? আমি প্রমথেশ বড়ুয়াকে ছবির শ্যুটিং করতে দেখেছি। কোলকাতার কোনো কোনো নির্মাতাও এখানে এসে ছবির শ্যুটিং করেছেন। তা হলে এখানে কেন ছবি হবে না? মি. দোসানী আপনি জেনে রাখুন, যদি আগামী এক বছরের মধ্যে কেউ ছবি না করে তবে আমি জব্বার খানই তা বানিয়ে প্রমাণ করব।*' বলা যায় এ চ্যালেঞ্জের জবাব থেকেই পরের বছর আবদুল জব্বার খান শুরু করেন পাকিস্তান তথা বাংলাদেশের প্রথম পূর্ণাঙ্গ সবাক বাংলা ছবি 'মুখ ও মুখোশ'-এর কাজ। এই উদ্দেশ্যে আবদুল জব্বার খান ও কয়েকজন মিলে গঠন করেন 'ইকবাল ফিল্মস লিমিটেড'।

ইকবাল ফিল্মস লিমিটেড

'ইকবাল ফিল্মস' প্রথম স্থাপিত হয় বিভাগপূর্ব সময়ে কোলকাতায় শহীদুল আলমের নেতৃত্বে কবি ইকবালের নামে। পাকিস্তান হওয়ার পর ইকবাল ফিল্মস-এর একটি সভা হয় ১৯৫৩ সালের ২৩ আগস্ট তারিখে। সে বছরের ৩০ আগস্ট সংখ্যায় সাপ্তাহিক 'বেগম'-এর একটি সংবাদ থেকে জানা যায়, ইকবাল ফিল্মের এ সভাটি অনুষ্ঠিত হয় ৫১ নম্বর নারিন্দা রোডের বাসায়। এ সভায় সভাপতিত্ব করেন স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তানের পরিচালক মহিউদ্দিন। এতে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন সাংবাদিক মোহাম্মদ মোদাব্বের। সভায় স্থির করা হয় 'ইকবাল ফিল্মস' প্রাথমিক প্রচেষ্টা হিসেবে প্রামাণ্য ও কাহিনীচিত্র তৈরি করবে। পুনর্গঠিত ইকবাল ফিল্মসের চেয়ারম্যান হন এম এ হাসান (বলাকার মালিক)। আর নূরুজ্জামান হন ম্যানেজিং ডিরেক্টর। পরিচালক হন আবদুল জব্বার খান, এম এ মালেক, শহীদুর রহমান, কলিমউদ্দীন আহমদ (অভিনেতা

আলমগীরের পিতা) ও শহীদুল আলম জনাব আলম কোলকাতায় 'অজন্তা ফিল্ম' গড়েছিলেন।*

একটি পূর্ণাঙ্গ ছবি তৈরির আগে 'ইকবাল ফিল্মস' ১৯৫৪ সালের বন্যার ওপর একটি প্রামাণ্যচিত্র প্রযোজনা করেন। এ ছবির জন্য ক্যামেরা যোগাড় করা হয় কোলকাতা থেকে। আবদুল জব্বার খান পরিচালিত এ প্রামাণ্যচিত্রটির ধারা বিবরণীতে কণ্ঠ দেন ফতেহ লোহানী। ১৯৫৪ সালের ৬ আগস্ট 'ইকবাল ফিল্মসের' পূর্ণাঙ্গ ছবি 'মুখ ও মুখোশ'-এর মহরত হয় হোটেল শাহবাগে। মহরতে গভর্নর মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা উদ্বোধনী ভাষণ দেন।

I accepted the invitation to take part in this ceremony with great pleasure in order to demonstrate the importance Government give to the indigenous production of cinema films and the establisment of a fast class studio. Cinema has an educative value, but its value as an aquency which provides entertainment for the people far transcends any thing else. It is imperative for the people to have amusement and amusement of the order to forget for however short a time, the cares and wornes of the world. I hope this venture of Messers Iqbal Films Limited will encourage art and music in this province which is so rich and which, with a little encouragement, can reach great heights.

I wish Messers Iqbal Limited all success and good fortune in their great ventur.

মুখ ও মুখোশ

আবদুল জব্বার খান পরিচালিত 'মুখ ও মুখোশ' মুক্তি পায় ১৯৫৬ সালের ৩ আগস্ট। এ ছবিতে অভিনয় করেন পূর্ণিমা, নাজমা, জহরত আরা, রহিমা, ফায়জা, বিলকিস, খালেদা, ইনাম আহমদ, আবদুল জব্বার খান, আলী মনসুর, বিনয় বিশ্বাস, এফ করিম, সাইফুদ্দীন, আমিনুল হক, আতাউর রহমান, নূরুল আনাম খাঁ, রসিদ, সোনা মিয়া, কামরুজ্জামান, ভবেশ, রেদওয়ান, গওহর, জহির, আবুল খায়ের, বিলকিস বারী প্রমুখ ছবির চিত্রগ্রহণ করেন কিউ এম জামান, সঙ্গীত পরিচালনা করেন সমর দাস, সম্পাদনা করেন এম এ লতিফ, গান রচনা করেন আবদুল গফুর সারথী, গানে কণ্ঠ দেন আবদুল আলীম ও মাহবুবা হাসনাত

স্টুডিও-ল্যাবটেরিহীন পরিবেশে নানা বাধা-বিপত্তির মধ্যে ঢাকা ও তার আশপাশে এ ছবির শুটিং করা হয়। ছবির প্রিন্টিং ও প্রসেসিংয়ের কাজ হয় লাহোরের শাহনূর স্টুডিওতে

ছবির পরিচালক আবদুল জব্বার খান ছিলেন পেশায় প্রকৌশলী, নেশায় নাট্যকর্মী। চল্লিশ ও পঞ্চাশ দশকে ঢাকার নাট্যাঙ্গনে তিনি অভিনেতা-নাট্যকার-নির্দেশক-সংগঠক

হিসেবে আগমন করেন নাটকের অভিজ্ঞতার আলোকে তিনি চলচ্চিত্র নির্মাণে ব্রতী হন। তার পরিচালিত 'মুখ ও মুখোশ' ঢাকা তথা বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্পের ইতিহাসের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়।

কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লি.

পশ্চিম পাকিস্তানে যদি ছবি তৈরি হতে পারে তবে পূর্ব পাকিস্তানে ছবি হবে না কেন? এ তাড়না বারবার পীড়িত করছিল পরিসংখ্যান ব্যুরোর পরিচালক ডক্টর আবদুস সাদেককে। পূর্ব পাকিস্তানে চলচ্চিত্র তৈরি হতে হবে এ উদ্দেশ্যে তিনি কয়েকজনকে নিয়ে গঠন করেন 'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড, ঢাকা'। এ সমিতির উদ্দেশ্য ছিল :

১. পূর্ব বাংলায় চলচ্চিত্র শিল্পের উন্নয়ন।
২. একটি স্বনির্ভর স্টুডিও স্থাপন করা। যেখান থেকে শৈল্পিক, বাণিজ্যিক, সামাজিক, সাংস্কৃতিক, শিক্ষামূলক ইত্যাদি সব ধরনের ছবি তৈরি হবে।
৩. চলচ্চিত্র নির্মাণের সব ধরনের কাঁচামালের ব্যবস্থা করা।
৪. ডিস্ক ও রেকর্ডিং-এর জন্য প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া।
৫. সব ধরনের বাদ্যযন্ত্র তৈরি করা, গ্রামোফোন, রেকর্ড, টিভি সেট ও আনুষঙ্গিক যন্ত্রপাতির ব্যবস্থা করা।
৬. প্রেক্ষাগৃহ তৈরি করা।
৭. স্টুডিও, ল্যাবরেটরি এবং অন্যান্য ভাড়া দেয়া।
৮. সরকারি ও বেসরকারি পর্যায়ে প্রচারচিত্র তৈরি করা।
৯. শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক বইপত্র প্রকাশ ও ছবি নির্মাণের কারিগরি জ্ঞানার্জনের জন্য ইনস্টিটিউট স্থাপন।

এ সমিতির মূলধন বিশ লাখ টাকা। ১৯৫৪ সালের ১৩ এপ্রিল এটি রেজিস্ট্রি করা হয় ১৯৪০ সালের বেঙ্গল কো-অপারেটিভ অ্যাক্ট অনুসারে।

পরিচালকমণ্ডলী : সমিতির প্রথম পরিচালকমণ্ডলীর মধ্যে ছিলেন— সভাপতি ও কেষাধ্যক্ষ ডক্টর আবদুস সাদেক (পরিচালক, পরিসংখ্যান ব্যুরো, পূর্ববাংলা)। সহ-সভাপতি : খলিল আহমেদ (অভিনেতা বুলবুল আহমেদের পিতা, অবসরপ্রাপ্ত উপ-সচিব, নাট্যকার, অভিনেতা)। সাধারণ সম্পাদক : এম হোসেন (অর্থনীতিবিদ, প্রাদেশিক পরিসংখ্যান ব্যুরো, পূর্ববাংলা)। সদস্য : আ. ন. ম. শামসুল হক (গোয়েন্দা অফিসার, এসবি), রমজান আলী খান মজলিশ (প্রকাশনা অফিসার এসবি), জসীমউদ্‌দীন (কবি), এম এন মোমেন (নাট্যকার), কাজী এ খালেক (স্বপন কুমার, অভিনেতা), সারোয়ার হোসেন (চিত্র পরিচালক), আজিজুল হক, ননী দে ও অলিউল্লাহ (অভিনেত্রী রোজীর পিতা)। এ সংগঠনের সঙ্গে সিকান্দার আবু জাফরও জড়িত ছিলেন।

কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স লিমিটেড-এর প্রথম উদ্যোগ হচ্ছে 'আপ্যায়ন' নামে একটি স্বল্পদৈর্ঘ্যের ছবি নির্মাণ। এ ছবির কাহিনীকার হচ্ছেন ডক্টর আবদুস সাদেক, চিত্রনাট্য-সংলাপকার-পরিচালক হচ্ছেন সারোয়ার হোসেন, চিত্রগ্রহণে— সাধন রায়, নায়কের ভূমিকায় আখতার হোসেন এবং নায়িকা হন পাঁপড়ি (তিনি লেখক বেদুইন শমশেরের শ্যালিকা, গায়িকা নীরু, শামসুন্নাহারের বোন এবং পরে তিনি সাদেকা সাইদ নামে গল্প লিখেন)।

১৯৫৪ সালের ১৩ আগস্ট 'আপ্যায়ন'-এর শুটিং হয় ডক্টর মফিজ চৌধুরীর (পরে মন্ত্রী) আজিমপুরস্থ বাসায়। শুটিং-এর সময় উপস্থিত ছিলেন সাহিত্যিক শামসুদ্দীন আবুল কালাম ও তার স্ত্রী হোসনে আরা এবং রোজীর বাবা অলিউল্লাহ। ঢাকায় প্রথম ছবি হচ্ছে এ উপলক্ষে সবাইকে আপ্যায়ন করা হচ্ছে— এ বিষয় নিয়ে এক রিলের এই প্রামাণ্যচিত্রটি লাহোর পাঠানো হয় প্রসেসের জন্য। ছবিটি আর পরে ফেরত আসেনি। 'আপ্যায়ন'-এর সঙ্গীত পরিচালনায় ছিলেন কাদের জামেরী ও ধীর আলী। এ ছবিতে গান গেয়েছিলেন মাহবুবা হাসনাত ও নীরু শামসুন্নাহার। ছবির গানের রিহার্সাল হয়েছিল ঢাকা সেনানিবাসে, এক ক্যাপ্টেনের সহায়তায়। গান রেকর্ডিংয়ের জন্য টেপ রেকর্ডর দিয়েছিল 'ফ্রি এশিয়া' নামে একটি সংগঠক।

'আপ্যায়ন'-এর পর এ সমিতির উদ্যোগে শুরু হয় দ্বিতীয় ছবি 'ঋতুমঙ্গল'-এর কাজ। এ ছবিতে অভিনয় করেন আমিনুল হক, কাজী খালেক, আয়েশা আখতার, হাবিবুল্লাহ, নূরুল আনাম খাঁ। এ ছবির শুটিং হয়েছিল পাঁচ-সাত দিন। ক্যামেরাম্যান ছিলেন সাধন রায়।

'কো-অপারেটিভ ফিল্ম মেকার্স' পরে বিলুপ্ত হয়ে যায় নানা কারণে।[১৮]

'মহুয়া', 'মাসুম' ও 'পয়সে'

১৯৫৫ সালের দিকে ঢাকায় 'মহুয়া' নামে একটি ছবি তৈরির চেষ্টা চলে বলে বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়। সামিরা স্টুডিওর মালিক জনাব আলী এ ছবির প্রযোজক ছিলেন। ওই ছবির নায়িকা ছিলেন রাণী সরকার, চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে ছিলেন সাধন রায়। শেখ লতিফ জড়িত ছিলেন প্রোডাকশনের সঙ্গে।

১৯৫৫ সালে 'মাসুম আর্ট' নামে পূর্ব পাকিস্তানের একটি প্রতিষ্ঠান 'মাসুম' নামে একটি হিন্দি ছবির নাম ঘোষণা করে বলে ১৯৫৫ সালের ১৪ আগস্টের সাপ্তাহিক 'চিত্রালী' থেকে জানা যায়। পরে আর সে ছবিটি হয়নি।

এদিকে ১৯৫৭ সালের এপ্রিল-মে মাসের দিকে ঢাকার চিত্রব্যবসায়ী ক্যাপ্টেন এ এন আই রহমান (এহতেশাম) 'পয়সে' নামে উর্দু ভাষায় একটি ছবি করার কথা ঘোষণা করেন। ওই ছবি পরিচালনার দায়িত্ব দেয়া হয় লন্ডনের পাইনউড স্টুডিওর চিত্রগ্রাহক ফজলুর রহমানকে। ছবিতে অভিনয়ের জন্য নির্বাচন করা হয় মেহেরবানু, জাফরী, ইউনুস, মির্জা ফরহাদ, মুসলিম, কালাম প্রমুখ শিল্পীকে। সুরকার মোসলেহ উদ্দিনকে

দেয়া হয় সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্ব। কিন্তু তৎকালীন পূর্ববঙ্গ সরকার উর্দু ছবি করার জন্য ক্যাপ্টেন রহমানকে অনুমতি দেননি।[১১]

চলচ্চিত্র সমিতি

দেশ বিভাগের পর ঢাকায় চলচ্চিত্র প্রদর্শক ও পরিবেশকদের দুটো আলাদা সংগঠনের জন্ম হয়। এ দুই সমিতির নেতৃত্ব দেন চৌধুরী লবিবউদ্দিন আহমেদ সিদ্দিকী, মির্জা আবদুল কাদের ও পুষ্পনাথ দে। অন্যদিকে ক্যাপ্টেন এস এ এইচ জায়েদী গড়ে তোলেন আলাদা একটি সংগঠন।

এ সংগঠনের নাম ছিল 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র সমিতি'। ১৯৫১ সালে সব সংগঠন একই সংগঠনের পতাকাতলে মিলিত হয় ব্যবসায়িক স্বার্থে। তখন সমিতির নেতৃত্বে আসেন ক্যাপ্টেন জায়েদী, লবিবউদ্দীন আহমেদ সিদ্দিকী, ইফতেখারুল আলম প্রমুখ।

প্রেক্ষাগৃহে শুধু পাকিস্তানি ছবি চলবে, না ভারতীয় ছবিও চলবে এ নিয়ে মতভেদ সৃষ্টি হয় সমিতির সদস্যদের মধ্যে। ১৯৫২ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র সমিতি' ভেঙে যায়। গঠিত হয় আলাদা সংগঠন 'পূর্ববঙ্গ চলচ্চিত্র সমিতি' নামে।

১৯৫৩ সালের মে সংখ্যা মাসিক 'সিনেমা' থেকে জানা যায় যে, ১৯৫৩ সালের ২৯ মে তারিখে গুলিস্তান প্রেক্ষাগৃহে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র সমিতি'র প্রথম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলন উদ্বোধন করেন তৎকালীন প্রাদেশিক শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী এস এ সেলিম। সমিতির কর্মকর্তারা ভারতীয় ছবি আমদানির ফলে উদ্ভূত সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন। মন্ত্রী তার ভাষণে বলেন যে, তিনি ভারতীয় ছবি আমদানির বিপক্ষে কোনো যুক্তি দেখেন না। তিনি চিত্র ব্যবসায়ীদেরকে স্থানীয়ভাবে ছবি নির্মাণ ও স্টুডিও স্থাপন করার আহ্বান জানান। উক্ত সম্মেলনে বক্তব্য রাখেন সমিতির যুগ্ম সম্পাদক ক্যাপ্টেন রহমান ও অন্যতম কর্মকর্তা ইফতেখারুল আলম

১৯৫৬ সালে 'পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র সমিতি'র সভাপতি হন এ এ সিদ্দিকী। সমিতির অন্যান্য কর্মকর্তাদের মধ্যে ছিলেন এফ এ দোসানী, এ এন আই রহমান, ইফতেখারুল আলম প্রমুখ। পরিচালক জাহাঙ্গীর খানকে ঢাকায় এক সংবর্ধনা দেয়।

অন্যদিকে 'পূর্ববঙ্গ চলচ্চিত্র সমিতি'র নেতৃত্ব দেন আবু নাসের আহমদ।[১২]

পরিবেশনা সংস্থা

দেশ বিভাগের পর ঢাকায় যেসব প্রতিষ্ঠান বিদেশী ছবি পরিবেশন করত তার মধ্যে ঢাকা পিকচার প্যালেস, সোসাইটি পিকচার্স লি., ইস্ট পাকিস্তান ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর, কল্পনা ফিল্মস, ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর, পাকিস্তান ফিল্ম সার্ভিস, স্কাডার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর, লায়ন ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর, নিউ পিকচার লি.-এর নাম জানা যায়। পরে এখানে গড়ে ওঠে দোসানী ফিল্মস, লিও ফিল্মস, স্টার ফিল্মস প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান

মাসিক 'উদয়নের' দ্বিতীয় বর্ষ, দ্বিতীয় সংখ্যা, মার্চ-এপ্রিল, ১৯৫২ থেকে জানা যায়

স্কাডার ফিল্মস, কসমস ফিল্মস, মল্লিক ফিল্মস, ঢাকা ফিল্মসের নাম। ১৯৫৫ সালের দিকে পরিবেশনা সংস্থার সংখ্যা অনেক বেড়ে যায়

পঞ্চাশ দশকের মধ্যভাগে যেসব পরিবেশনা সংস্থা ঢাকায় ছিল নিচে তা দেয়া হলো। এই তালিকা ছাপা হয়েছে 'বোম্বে স্ক্রিন ইয়ার বুকে' (১৯৫৬) :

১. এশিয়ান পিকচার, ৩, নবাবপুর ঢাকা।
২. বেস্ট ফিল্মস একচেঞ্জ, ২৫০, নবাবপুর, ঢাকা
৩. ক্রিসেন্ট ডিস্ট্রিবিউটরস লিঃ, গুলিস্তান বিল্ডিং, ঢাকা।
৪. ঢাকা ফিল্মস, মুকুল সিনেমা বিল্ডিং, ঢাকা।
৫. ইস্টার্ন পাকিস্তান ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটর, ১৪, বাংলাবাজার, ঢাকা।
৬. ইস্ট অ্যান্ড ওয়েস্ট ফিল্মস, ৬, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।
৭. এভারেডি পিকচার্স, ৭১, পটুয়াটুলী, ঢাকা
৮. এভারসাইন ফিল্মস, ফরাশগঞ্জ রোড, ঢাকা।
৯. ইন্দোপাক ফিল্মস, তাঁতী বাজার, ঢাকা।
১০. কাপুরচন্দ লিঃ, ১৬, কোর্ট হাউস স্ট্রিট, ঢাকা।
১১. কল্পনা ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটররস, হংস থিয়েটার বিল্ডিং, নারায়ণগঞ্জ।
১২. কেবি ফিল্মস তাঁতী বাজার, ঢাকা
১৩. খৈয়াম ফিল্মস, ১৯৫, নবাবপুর রোড, ঢাকা।
১৪. মিরা ফিল্মস, হংস থিয়েটার বিল্ডিং, নারায়ণগঞ্জ।
১৫. মুভিস্তান, ৬, নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।
১৬. মুকুল ফিল্মস, মুকুল সিনেমা বিল্ডিং, ঢাকা।
১৭. নিউ ফিল্মস লিঃ, নিশাত সিনেমা বিল্ডিং, ঢাকা।
১৮. নিউ লাইট পিকচার্স, ৭৮, লয়াল স্ট্রিট, ঢাকা।
১৯. পাকিস্তান ফিল্মস ট্রাস্ট, ২২৬, নবাবপুর রোড, ঢাকা।
২০. রেইনবো পিকচার্স লিঃ, ২৬, পটুয়াটুলী, ঢাকা।
২১. রয়্যাল ফিল্মস, ৯০, নওয়াবপুর রোড, ঢাকা।
২২. সরগম পিকচার্স, ৬ নর্থব্রুক হল রোড, ঢাকা।
২৩. স্ক্রিন ফিল্মস ডিস্ট্রিবিউটরস : ১৮, লয়াল স্ট্রিট, ঢাকা।
২৪. স্টার ফিল্ম ডিস্ট্রিবিউটর, ৭৮/৩, লয়াল স্ট্রিট, ঢাকা।[১৩]

চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা

১৯৫৭ খ্রিস্টাব্দের ৩ এপ্রিল পূর্ব পাকিস্তান আইন পরিষদে তৎকালীন প্রাদেশিক মন্ত্রী বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের উদ্যোগে পূর্ব পাকিস্তান চলচ্চিত্র উন্নয়ন সংস্থা বিল পাস হয়। এ বিল পাসের মাধ্যমে বর্তমান বাংলাদেশ অঞ্চলে চলচ্চিত্র নির্মাণের বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধাসহ একটি স্থায়ী ফিল্ম স্টুডিও ও ল্যাবরেটরি স্থাপিত হয়। এ সংস্থার

নির্বাহী পরিচালক হন প্রাদেশিক চলচ্চিত্র ইউনিটের প্রধান নাজীর আহমদ।

এফডিসি প্রতিষ্ঠার পর এখানে 'আসিয়া', 'জাগো হুয় সাভেরা', 'এ দেশ তোমার আমার', 'মাটির পাহাড়', 'আকাশ আর মাটি', 'রাজধানীর বুকে' প্রভৃতি কয়েকটি পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র নির্মিত হয় ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে। প্রতিষ্ঠালগ্নে এ চলচ্চিত্রগুলোতে নির্মাণকুশলতা ও রুচিশীলতার ছাপ থাকলেও অস্থানীয় বাণিজ্যিক ছবির সঙ্গে প্রতিযোগিতায় বক্স অফিসের আনুকূল্য পেতে ব্যর্থ হয়।

চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা

মুঘল-নবাব-জমিদার-বাঈজীর শহর ঢাকায় প্রথম 'বায়োস্কোপ' দেখানো হয় ১৮৯৮ সালের ১৭ এপ্রিল— পুরনো ঢাকার ক্রাউন থিয়েটারে। বলা যায় এর পরের সপ্তাহ থেকেই পুরনো ঢাকায় সূত্রপাত হয় চলচ্চিত্রে সাংবাদিকতারও ১৮৯৮ সালের ২৪ এপ্রিল সাপ্তাহিক 'ঢাকা প্রকাশ' ওই বায়োস্কোপের প্রদর্শনীর পূর্ণ বিবরণ প্রকাশ করে জানা মতে, এটিই প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক পূর্ণাঙ্গ প্রতিবেদন। 'ঢাকা প্রকাশ'-এ এরপর মাঝে মধ্যে চলচ্চিত্র বিষয়ক সংবাদ, বিজ্ঞাপন ছাপা হতো।

এ শতকের গোড়ার দিকে কোলকাতা ছিল অভিজাত নগরী। রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক কারণে কোলকাতার গুরুত্ব ছিল বেশি। এ কারণে ওখানেই গড়ে ওঠে চলচ্চিত্র শিল্প। এ বিশালতা গড়ে ওঠার পেছনে পথিকৃৎ-এর ভূমিকা রাখেন পুরনো ঢাকার জিন্দাবাহার লেনের উকিল চন্দ্রমোহন সেনের দুই পুত্র হীরালাল সেন ও মতিলাল সেন এবং বরিশালের ধীরেন গাঙ্গুলী। পরে এদের পথ ধরে পূর্ববঙ্গের আরো অনেকে কোলকাতাকেই বেছে নেন প্রতিভা বিকাশের কেন্দ্র হিসেবে। ছবির সংখ্যা বাড়ছে, বাড়ছে পাত্র-পাত্রী, কলা-কুশলীর সংখ্যা। সেই সঙ্গে বাড়ছে ছায়াছবির প্রতি মানুষের আগ্রহও। এ অবস্থায় চলচ্চিত্র শিল্পের খবরাখবর, আলোচনা-সমালোচনা ঠাঁই পায় পত্রপত্রিকায়। আস্তে আস্তে গড়ে উঠতে থাকে চলচ্চিত্র নির্ভর সাংবাদিকতাও। আমাদের ময়মনসিংহের বিমল পাল বিশের দশকে কোলকাতা থেকে 'বায়োস্কোপ' নামে একটি আলাদা পত্রিকাই বের করেন। এদিকে ঢাকা একদম ফাঁকা। এখানে ছবি তৈরি হয় না, নায়ক নেই, নায়িকা নেই, ক্যামেরাম্যান নেই। এখানকার পিকচার হাউজে, সিনেমা প্যালেসে (রূপমহল), নায়নে, মুকুলে কেবলই দেখানো হয় কোলকাতা ও বিদেশের ছবি। কিন্তু তবু ঢাকার হাতেগোনা কয়েকটি পত্রিকায় ঠাঁই পায় ছায়াছবির খবর।

বিশের দশকের শেষদিকে ঢাকায় নবাববাড়ির খাজাদের উদ্যোগে শুরু হয় ছবি নির্মাণ। আর ওই সময় ঢাকা থেকে প্রকাশিত কয়েকটি পত্রপত্রিকা চলচ্চিত্র বিষয়ে নিয়মিত খবর, আলোচনা বিজ্ঞাপন ছাপতে থাকে। এসব পত্রপত্রিকার মধ্যে ছিল সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী', সাপ্তাহিক 'সোনার বাংলা', সাপ্তাহিক 'চাবুক' ও সাপ্তাহিক 'আমান'।

ত্রিশ দশকে প্রকাশিত হয় চলচ্চিত্র ত্রৈমাসিক 'চিত্রকলা' ঢাকার রূপলাল হাউজ থেকে।

সচিত্র সাপ্তাহিক 'বাংলার বাণী' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯২৮-২৯ সালের দিকে এর সম্পাদক ছিলেন বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামের বিশিষ্ট সাহিত্যিক নলিনী কিশোর গুহ (জন্ম ১৮৯২)। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো ঢাকার ৪০নং কলতাবাজার থেকে। এই পত্রিকায় ১৯৩১ সালের ২৫ জুন ছাপা হয় ঢাকার প্রথম নির্বাক পূর্ণাঙ্গ ছবি 'শেষ চুম্বন' ('দি লাস্ট কিস')-এর সচিত্র বিজ্ঞাপন।

নলিনী কিশোর গুহ চলচ্চিত্র সাংবাদিকতায় বৈচিত্র্য আনেন তার সম্পাদিত আরেকটি সাপ্তাহিক পত্রিকা 'সোনার বাংলা'য়। এ প্রত্রিকা ১৯৩৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয় ঢাকার ৫০নং জনসন রোড থেকে। সোনার বাংলায় চলচ্চিত্র বিষয়ক স্টুডিও রিপোর্ট, আলোচনা, সমালোচনা, ছাপা হতো 'নাট্যজগৎ' বিভাগে। এ পত্রিকায় ১৯৩৫ সালের ১৪ ডিসেম্বর 'নাট্যজগৎ' বিভাগে সাংবাদিক চিত্ত সেন বাংলার ফিল্ম শিল্পের ভবিষ্যৎ, কোলকাতার রূপবাণী প্রেক্ষাগৃহ, কালী ফিল্মস, নিউ থিয়েটার্স, পপুলার পিকচার্স ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছবির খবরা-খবর লিখেছেন এ পত্রিকার পক্ষ থেকে 'ছায়ালোকের নর-নারী' নাম একটি বইও প্রকাশ করা হয় সে সময়। পত্রিকার ১৯৩৪ সালের ২০ জানুয়ারি সংখ্যায় এ ব্যাপারে একটি বিজ্ঞাপন ছাপা হয়

'বাংলার বাণী' ও 'সোনার বাংলা'কে ছাড়িয়ে সাপ্তাহিক 'চাবুক' চলচ্চিত্র বিষয়ক বিভাগের নামই রাখে 'ছায়াছবির কথা'। বিষয়টি চলচ্চিত্র সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এই পত্রিকায় 'ছায়াছবির কথা' বিভাগে শ্রী চিত্রামোদী শর্মা ১৯৩৩ সালে মুক্তিপ্রাপ্ত ছবি নিয়ে আলোচনা করেছেন। একই সংখ্যায় আলাদাভাবে ছাপা হয়েছে 'এ ফেযার ওয়েল টু আর্মস' ছবির সমালোচনা। ছবিটি ওই সময় মুকুল হলে প্রদর্শিত হয়। এসব আলোচনা-সমালোচনা ছাপা হয় ১৯৩৪ সালের ৬ মার্চ সংখ্যায়। 'চাবুক'-এর সম্পাদক ছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সাহা। এটি প্রকাশিত হতো ঢাকার ৫২নং জনসন রোড থেকে।

বিশের দশকে ঢাকা থেকে আরেকটি পত্রিকা সাপ্তাহিক 'আমান'ও চলচ্চিত্র সাংবাদিকতা চালু করে। এ পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন নারায়ণগঞ্জ জেলার আড়াইহাজার থানার মানেহর গ্রামের রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব তফাজ্জল হোসেন (১৯০৩-১৯৬৬)। 'আমান' পত্রিকায় ১৯৩৮ সালের ৫ আগস্ট (১০ বর্ষ) সংখ্যায় ছাপা হয় 'গোরা' চলচ্চিত্রের সমালোচনা। একই সংখ্যায় মুকুল, রূপমহল, পিকচার হাউজ-এ প্রদর্শিত ছবির বিজ্ঞাপনও ছাপা হয়। ওদিকে ত্রিশের দশকে কোলকাতা থেকে প্রকাশিত চাঁদপুরের মোহাম্মদ নাসিরউদ্দিন সম্পাদিত মাসিক 'সওগাত'-এ চালু করা হয় আলাদা ছায়ামঞ্চ বিভাগ।

চল্লিশের দশকের শেষপ্রান্তে আরেকটি পত্রিকা মাসিক 'কাফেলা'য় চিত্রবাণী বিভাগ খুলেন ঢাকার উদয়ন চৌধুরী (নাট্যকার, অভিনেতা, পরিচালক)।

মাসিক 'সওগাত' ও 'কাফেলা' দেশ বিভাগের পর ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় অন্যদিকে দেশ বিভাগের পর 'সোনার বাংলা' ও 'চাবুক' পত্রিকায় চলচ্চিত্র বিষয়ক লেখালেখি অব্যাহত থাকে

কয়েকটি চলচ্চিত্র পত্রিকা

চিত্রকলা

ঢাকার প্রথম চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা ত্রৈমাসিক 'চিত্রকলা' প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ খ্রিস্টাব্দের রূপলাল হাউজ থেকে। এ সম্পর্কে বিস্তারিত জানা যায়নি।

সিনেমা

চলচ্চিত্র মাসিক 'সিনেমা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালে বগুড়া থেকে। পত্রিকার সম্পাদক ফজলুল হক পরিবেশিত তথ্য থেকে শুধু এটুকুই জানা যায়। 'সিনেমা' ঢাকা থেকে প্রকাশিত হয় জাঁকজমকের সঙ্গে ১৯৫১ সালে 'সিনেমা'র দ্বিতীয় বর্ষ ৫ম-৬ষ্ঠ সংখ্যা, ১৯৫২ (আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব সংখ্যা) থেকে জানা যায়, এ পত্রিকাটি ২, এ সি রায় রোড, ঢাকা থেকে প্রকাশিত হতো। এর প্রধান পৃষ্ঠপোষক হিসেবে নাম ছাপা হয় বেগম নাসিম বানুর। সম্পাদকমণ্ডলীতে ছিলেন সুরেন রায়, জেব-উন-নেসা খানম, ফজলুল হক ও ফজলুল করিম। সম্পাদক ছিলেন আবু তাহের মোহাম্মদ ফজলুল হক।

এ পত্রিকা প্রকাশিত হওয়ার সময় এ দেশে কোনো চলচ্চিত্র শিল্প গড়ে ওঠেনি কাজেই তখন স্বাভাবিকভাবেই বোম্বে, কোলকাতা, করাচি, লাহোরের ছবির খবরা-খবরই ছাপা হতো অন্যান্য বিদেশী চিত্রজগতের খবরও 'সিনেমা'য় থাকতো সিনেমায় প্রকাশিত লেখা ছিল খুবই ধারালো, ব্যঙ্গপূর্ণ। এ পত্রিকায় থাকতো গল্প, উপন্যাস, নাটক, চিঠিপত্রের জবাব, ছবির সমালোচনা, হাস্য কৌতুকও। আর্থিক কারণে পত্রিকাটি প্রকাশনা নিয়মিত হয়নি। সিনেমা'র সর্বশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫৯ সালে বিপ্লব দিবস উপলক্ষে। এরপর আর কোনো সংখ্যা প্রকাশিত হয়েছে বলে জানা নেই। 'সিনেমা'য় তখন দেশের অনেক খ্যাতনামা লেখক বুদ্ধিজীবীরাই লিখতেন। এদের মধ্যে ছিলেন রাবেয়া খাতুন, ফজলুল করিম, ইফতেখারুল আলম, সন্তোষ কুমার বসাক, ডাক্তার শাদাত আলী খান, জহির রায়হান, আফজাল চৌধুরী, হুমায়ূন কবীর, অসিত মুখোপাধ্যায়, সাইদ আহমদ প্রমুখ।

উদয়ন

'উদয়ন' নিখাদ চলচ্চিত্র বিষয়ক পত্রিকা না হলেও এতে অন্যান্য বিষয়ের সঙ্গে চলচ্চিত্র অন্তর্ভুক্ত ছিল 'উদয়ন'-এর প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯৫০ সালের জানুয়ারিতে। চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত এ মাসিক পত্রিকাটির সম্পাদক-প্রকাশক ছিলেন রুহুল আমিন নিজামী (পরে স্টান্ডার্ড প্রকাশনীর মালিক)। এর মূল্য ছিল আটআনা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ৯৮ (প্রচ্ছদসহ)। তখনকার সময়ে কোলকাতা থেকে 'রূপাঞ্জলী', 'দিপালী', 'সচিত্র ভারত' নামে যেসব পত্রপত্রিকা বের হতো 'উদয়ন'কে সেসবের সঙ্গে রীতিমতো প্রতিযোগিতা করতে হতো।

'উদয়ন'-এর প্রথম সংখ্যা ছাপা হয়েছিল তিন হাজার কপি। প্রথম পৃষ্ঠা শোভিত হয়েছিল চার রঙে। ডিমাই সাইজ আকারে 'উদয়ন' ছ'মাস ধরে চলে, কোনো ফটো

প্রসেসে ব্লক তৈরি হতো না 'উদয়ন'-এর সব ফটো প্রসেস করা হতো কোলকাতায় বোম্বে থেকেও কিছু ফটো প্রসেস করে আনা হতো।

'উদয়ন'-এর চলচ্চিত্র বিভাগে লিখতেন সম্পাদক স্বয়ং। বিভিন্ন বিদেশী চলচ্চিত্রের গুরুগম্ভীর বিষয়ক নিবন্ধের অনুবাদও ছাপা হতো এ পত্রিকায়। 'চলচ্চিত্র সমালোচনা' বিভাগের নাম ছিল 'নবজাতকের খতিয়ান'। এ বিভাগে সবচেয়ে বিতর্কিত সমালোচনা বের হয় বোম্বের 'মহল' ছবির। 'উদয়ন'-এ প্রকাশিত সব লেখাই ছিল বামপন্থি ঘেঁষা। প্রগতিশীল লেখকরাই এ পত্রিকায় লিখতেন। এদের মধ্যে ছিলেন আবুল ফজল, মাহবুব-উল-আলম, সুরাইয়া চৌধুরী, শওকত ওসমান প্রমুখ। 'উদয়ন'-এর সর্বশেষ সংখ্যা বের হয় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের পূর্বে। ইতোমধ্যেই দেশের রাজনৈতিক পরিমণ্ডলে ধরপাকড় শুরু হয়। তখন বাধ্য হয়ে 'উদয়ন'-এর সম্পাদককে গা ঢাকা দিতে হয় তিনি কোলকাতা চলে যান। পরে সেখান থেকে 'উদয়ন'-এর দুটো সংখ্যা বের করেন 'উদয়ন' চালু থাকতেই আবদুল জব্বার খান পরিচালিত এ দেশের প্রথম বাংলা ছবি 'মুখ ও মুখোশ'-এর কাজ শুরু হয়।

'উদয়ন'-এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে গেলে রুহুল আমিন নিজামী পরে এ নামটি রাশিয়ান দূতাবাসের কাছে দিয়ে দেন। সেই 'উদয়ন' রাশিয়ান দূতাবাস থেকে নিয়মিত মাসিক হিসেবে বের হয়। পরে এর প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

ছায়াবাণী

এ পত্রিকাটি সম্বন্ধে তথ্য দেন বিশিষ্ট গল্পকার আখতারুজ্জামান ইলিয়াস। তার পরিবেশিত তথ্য মতে পত্রিকাটি ১৯৫০ সালে প্রকাশিত হয় এটি সম্পাদনা করেন বলিয়াদী জমিদার পরিবারের খালেদ সিদ্দিকী তিনি পরে গাইবান্ধার একটি প্রেক্ষাগৃহের মালিক থাকা অবস্থায় মারা যান। মাসিক 'ছায়াবাণী'র আয়ুষ্কাল ছিল খুবই অল্প। 'ছয়াবাণী' নামে অপর একটি পত্রিকা বের হয় সত্তর দশকের শেষাশেষি। এর প্রকাশক ছিলেন রফিকুল ইসলাম। ২৩২, নয়াটোলা থেকে এটি বের হতো। এর সম্পাদকের নাম জানা যায়নি।

রূপছায়া

'সিনেমা'র পর যে মাসিক পত্রিকাটি বিশিষ্টতার দাবি রাখে সেটি হচ্ছে 'রূপছায়া'। ১৯৫১ সালে জানুয়ারিতে 'রূপছায়া'র প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হয়। এর প্রকাশক সম্পাদক ছিলেন মীজানুর রহমান। প্রথমে অবশ্য সম্পাদক ছিলেন তার বড় ভাই মঈদ-উর রহমান। এরা দু'ভাই মিলে ১৯৪৯ সালে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের প্রথম কিশোর মাসিক 'ঝংকার' সম্পাদনা করেন। 'রূপছায়া' লেখা থাকত 'পূর্ববঙ্গ চলচ্চিত্র দর্শক সমাজের মুখপত্র' অবশ্য এতে চলচ্চিত্র ছাড়া অন্যান্য বিষয়ও থাকত। 'রূপছায়া' প্রকাশিত হতো ৬, রজনী বোস লেন, ঢাকা থেকে এবং ছাপা হতো চাবুক প্রিন্টিং প্রেস, ৫২, জনসন রোড ঢাকা থেকে। 'রূপছায়া'য় দেশের বিশিষ্ট লেখকদের বিভিন্ন লেখা ছাপা হতো। এতে লিখতেন শামসুল হক, বিপরীত চৌধুরী, কাজী মাসুম, উপেন্দ্রনাথ

গঙ্গোপাধ্যায়, ইফতিখার আহমদ, মীজানুর রহমান, বটু মাহমুদ, মঈদ-উর রহমান, সিরাজুল ইসলাম, কাজী খালেক, আহমদ মীর, শামসুর রাহমান, ফজল শাহাবুদ্দীন, খান আতাউর রহমান, ফতেহ লোহানী, উদয়ন চৌধুরী, শহীদ কাদরী, টিপু সুলতান, ওবায়েদ-উল-হক, প্রেমেন্দ মিত্র, শংকর জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী প্রমুখ। ১৯৬১ সালে 'রূপছায়া'র প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়

ছায়াছবি

১৯৫১ সালের মাসিক 'ছায়াছবি' নামে একটি অভিজাত সিনেমা পত্রিকা বের হয় বলে সাপ্তাহিক 'খাদেম' পত্রিকায় ১৯৫১ সালের ১২ অক্টোবর প্রকাশিত এক বিজ্ঞাপন থেকে জানা যায়। পত্রিকাটি প্রকাশিত হতো ৮৫, ক্যাপ্টেন বাজার, ঢাকা থেকে।

চিত্রালী

দৈনিক পত্রিকার আকারে চলচ্চিত্র ও সংস্কৃতি সাপ্তাহিক 'চিত্রালী' প্রথম পরীক্ষামূলকভাবে প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের ১৩ জুন। পরে আনুষ্ঠানিকভাবে 'চিত্রালী'র নিয়মিত প্রকাশনা শুরু হয় ১৯৫৪ সালের ১ জানুয়ারি থেকে সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজের সম্পাদনায়। ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক ছিলেন মুহম্মদ হাবিবুর রহমান, পরবর্তীকালের একজন বিশিষ্ট পদস্থ আমলা। প্রকাশক রুহুল আমিন। 'চিত্রালী' প্রকাশের সঙ্গে জড়িত ছিলেন শামসুল আলম, নূরুল ইসলাম, মুস্তাফিজুর রহমান, এ এফ এম নূরুল ইসলাম প্রমুখ। তখন 'চিত্রালী' ছাপা হতো বেঙ্গল প্রিন্টিং প্রেস, ৩০৪ পাটুয়াটুলী, ঢাকা থেকে এবং প্রকাশিত হতো কাউসার হাউস, সিদ্দিক বাজার, ঢাকা থেকে। ১৯৬০ সালে 'চিত্রালী' অবজারভার প্রকাশনীর পত্রিকা হিসেবে প্রকাশিত হতে থাকে। প্রথমে 'চিত্রালী' প্রকাশিত হতো রবিবারে। পরবর্তীকালে শুক্রবারে প্রকাশিত হতে থাকে। এ দেশের চলচ্চিত্র শিল্পের জন্মের আগে থেকে এই পত্রিকা চিত্রনির্মাণ, চিত্র সাংবাদিকতা তথা এ দেশের শিল্প-সাহিত্য সংস্কৃতির উন্নয়নে যে ভূমিকা রেখেছে তার তুলনা নেই 'চিত্রালী'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক পথিকৃৎ কলমী সৈনিক সৈয়দ মোহাম্মদ পারভেজ ১৯৭৯ সালের ২ এপ্রিল হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন। 'চিত্রালী' এ দেশের চিত্রসাংবাদিকতার এক গৌরবের সমাচার।

সচিত্র সন্ধানী

'সচিত্র সন্ধানী'র প্রথম প্রকাশ ঘটে মাসিক হিসেবে ১৯৫৬ সালের ২৩ জুন তারিখে। এর সম্পাদক ছিলেন গাজী শাহাবুদ্দীন আহমদ, প্রধান সম্পাদক হুমায়ূন খান এবং প্রকাশক নূরুল হক। এ পত্রিকার জন্মলগ্নে জড়িত ছিলেন চৌধুরী আবদুর রহীম, আতাউস সামাদ, শরফুদ্দীন আহমদ, মীর আনসার আলী, মুনীর আলম মীর্জা প্রমুখ জড়িত ছিলেন কাইয়ুম চৌধুরী, জহির রায়হান, সৈয়দ শামসুল হক, আনিসুজ্জামান, আনিস চৌধুরী প্রমুখও। 'সচিত্র সন্ধানী' পরবর্তীকালে পাক্ষিক হিসেবেও প্রকাশিত হয়। ১৯৭৮ সালের ২৩ এপ্রিল 'সচিত্র সন্ধানী' সাপ্তাহিক হিসেবে প্রকাশিত হয়। আকর্ষণীয় প্রচ্ছেদ, অঙ্গ-সৌষ্ঠব, গল্প, উপন্যাস, ফিচার প্রথম থেকে 'সচিত্র সন্ধানী'র বৈশিষ্ট্য ছিল।

শিল্প, সাহিত্য, সংস্কৃতি চলচ্চিত্রের রুচিশীল পত্রিকা সাপ্তাহিক 'সচিত্র সন্ধানী'র সম্পাদক গাজী শাহাবুদ্দীন পত্রিকাটির প্রকাশনা পরে বন্ধ হয়ে যায়।

রমনা

মাসিক 'রমনা' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৫৬ সালে মহিউদ্দীন আহমেদের সম্পাদনায়। মহিউদ্দীন আহমেদ 'আহমেদ মীর' নামে গল্প লিখতেন সাহিত্য, সংস্কৃতি ও চলচ্চিত্র বিষয়ক 'রমনা' পরে পাক্ষিক হিসেবেও প্রকাশিত হয়। ১৯৬০ সালে 'রমনা' চলচ্চিত্র সাপ্তাহিকী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। প্রকাশিত হতো বৃহস্পতিবারে। পরে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। 'রমনা' প্রকাশিত হতো ৪নং ফোল্ডার স্ট্রিট এবং ছাপা হতো প্যারামাউন্ট প্রেস, ঢাকা থেকে।

মৃদঙ্গ

১৯৫৮ সালের ১৪ আগস্ট তারিখে 'মৃদঙ্গ' প্রথম প্রকাশিত হয় এর সম্পাদক ছিলেন এম. মোস্তফা (চলচ্চিত্র পরিচালক মোস্তফা মেহমুদ) প্রথম সংখ্যায় লেখা ছিল হুমায়ূন কাদির, জহির রায়হান, বোরহান উদ্দিন খান জাহাঙ্গীর প্রমুখের। 'মৃদঙ্গ'-এর সর্বমেট ১৪টি সংখ্যা বের হয়েছিল। ১৯৫৯ সালে 'মৃদঙ্গ', ফজল শাহাবুদ্দীনের 'অরণ্য রাত্রি' উপন্যাস প্রকাশিত হওয়ার অভিযোগে সরকারি নিষেধাজ্ঞার ফলে এ পত্রিকাটির প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়।

তথ্য নির্দেশ

১. নাজীর আহমদের সাক্ষাৎকার, ২৬ ডিসেম্বর, ১৯৮৬
২. সাপ্তাহিক বেগম, ২৭ জুন, ১৯৪৮, কোলকাতা।
৩. অনুপম হায়াৎ, বাংলাদেশের চলচ্চিত্রের ইতিহাস, ১৯৮৭, ঢাকা, পৃ. ৩৪।
৪. উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত
৫. নাজীর আহমদের সাক্ষাৎকার, প্রাগুক্ত।
৬. প্রাগুক্ত।
৭. উদ্ধৃত, অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।
৮. অনুপম হায়াৎ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬।
৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬
১০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭
১১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
১২. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮।
১৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯।

চতুর্থ অধ্যায়

স্মৃতিময় চলচ্চিত্র

খাজা মওদুদের দেখা চলচ্চিত্র

ঢাকার আহসান মঞ্জিল এলাকার বাসিন্দা খাজা মওদুদ ছিলেন একজন বিশিষ্ট রাজনৈতিক কর্মী। তিনি কংগ্রেসি রাজনীতির সঙ্গে জড়িত ছিলেন ১৯২০-এর দশকে তিনি ঢাকা শহর খিলাফত কমিটি ও কংগ্রেসের একজন অন্যতম নেতা ছিলেন। তিনি একসময় ঢাকা শহর খিলাফত কমিটির কোষাধ্যক্ষও ছিলেন।

খাজা মওদুদ ছিলেন ঢাকায় বায়োস্কোপ চালুর যুগের অন্যতম দর্শক। তিনি নিয়মিত যে ডায়েরি লিখতেন তাতে রয়েছে বায়োস্কোপ দেখার তথ্য খাজা মওদুদ ষাটের দশকে মারা যান। খাজা মওদুদের ডায়েরিগুলো পাওয়া গেছে খাজা মোহাম্মদ হালিমের সৌজন্যে।

খাজা মওদুদ ১৯১৫ সালের ১৫ অক্টোবর খাজা হুমায়ূন কাদেরকে সঙ্গে নিয়ে সন্ধ্যার শোতে বায়োস্কোপ দেখতে যাওয়ার কথা লিখেছেন ডায়েরিতে। অনুমান করা হয়— তিনি আরমানীটোলাস্থ 'পিকচার হাউজ'-এ (বর্তমান শাবিস্তান) বায়োস্কোপ দেখেন। কারণ, তখন এটিই ছিল ঢাকার একমাত্র স্থায়ী পেক্ষাগৃহ। এটি তৈরি হয় ১৯১৩-১৪ সালের দিকে

তিনি ১৯১৬ সালের ১ জানুয়ারি নাইট শোতে বায়োস্কোপ দেখতে যান তার বড় ভাবী ও অন্যান্যকে নিয়ে। তিনি ২৫ এপ্রিল ও ৮ জুন রাতেও বায়োস্কোপ দেখেন।

খাজা মওদুদ ১৯১৬ সালের ২১ জুন রাতে নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহর পুত্র খাজা আজাদ ও খাজা বাহাউদ্দিনকে নিয়ে বায়োস্কোপ দেখেন। উল্লেখ্য, খাজা আজাদ পরে ঢাকার প্রথম স্বল্পদৈর্ঘ্য চিত্র 'সুকুমারী' (নির্বাক) ও পূর্ণাঙ্গ চিত্র 'দি লাস্ট কিস' (নির্বাক)-এর চিত্রগ্রহণ করেন।

২৫ জুন রাতে খাজা হুমায়ূন কাদের, তার স্ত্রী ও খাজা মওদুদ বায়োস্কোপ দেখেন। তারা বাসায় ফেরেন রাত ১টায়।

খাজা মওদুদ, নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহ ও তার স্ত্রী এবং খাজা বাহাউদ্দিন পিকচার হাউজে ছবি দেখেন ১৯১৭ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায়।

১৯১৮ সালের ২২ এপ্রিল নওয়াবজাদা খাজা আতিকুল্লাহর পল্টনস্থ বাসায় বায়োস্কোপ দেখানো হয়। খাজা মওদুদ ২০ জুলাই রাতে নওয়াবজাদা আতিকুল্লাহ তার

পুত্র খাজা আজাদও খাজা বাহাউদ্দিনকে নিয়ে পিকচার হাউজে বায়োস্কোপ দেখেন।

মওদুদ আরমানীটোলাস্থ পিকচার হাউজে নওয়াবজাদা খাজা আহসান উল্লাহ ও খাজা আজাদকে নিয়ে বিকাল ১টার সময় 'পেগ-১' নামে বায়োস্কোপ দেখেন ১৯১৯ সালের ১৬ মার্চ।

খাজা শামসুল হকের দেখা চলচ্চিত্র

খাজা শামসুল হকের জন্ম ঢাকায় ১৮৮৪ খ্রিস্টাব্দে তার পিতার নাম খাজা রহমতুল্লাহ। খাজা শামসুল হক পোস্ট অফিসে চাকরি করতেন তিনি ছিলেন একজন ক্রীড়াবিদ ও সাইক্লিস্ট। ঢাকায় বায়োস্কোপ চালুর সময় থেকে তিনি ছিলেন এর নিয়মিত দর্শক তিনি নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন ১৯০৫ থেকে মৃত্যুর আগে ১৯৭৭ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি ডায়েরি লিখেছেন। তার লেখা ডায়েরিতে ঢাকার বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সঙ্গে বায়োস্কোপের প্রসঙ্গও রয়েছে ঢাকার নওয়াব পরিবারের খাজা মোহাম্মদ হালিম (পৌরসভার সাবেক কমিশনার)-এর কাছে ডায়েরিগুলো সংরক্ষিত আছে।

খাজা শামসুল হক ১৯১৬ সালের ১২ সেপ্টেম্বর খাজা করিমুল্লাহ ও তার দু'পুত্রকে নিয়ে বায়োস্কোপ দেখেন নাইট শোতে। বায়োস্কোপে তারা দেখেন নেপোলিয়ান ও ওয়েলিংটনের মধ্যে ওয়াটার লু'র যুদ্ধ।

এরপর তার ছবি দেখার তথ্য পাই ১৯২৬ সালে। মাঝখানে তার লেখা ডায়েরি পাওয়া গেলেও ছবি দেখা সম্পর্কে কোনো তথ্য নেই।

১৯২৬ সালের ১ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টার সময় খাজা শামসুল হক ও আজিজুল আরমানীটোলাস্থ পিকচার হাউজে 'আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ' বায়োস্কোপ দেখেন। ১৯২৮ সালের ৮ সেপ্টেম্বর খাজা শামসুল হক পিকচার হাউজে 'আলী বাবা' ছবি দেখেন বলে লিখেছেন। তিনি একই প্রেক্ষাগৃহে ১৮ সেপ্টেম্বর 'মাই ড্যাডি' নামে আরেকটি বায়োস্কোপ দেখেন।

১৯২৮ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর খাজা শামসুল হক ও খাজা হামিদুল্লাহ পিকচার হাউজে 'গুলবা সাহনোয়ার' নামে বায়োস্কোপ দেখেন। তারা ২৯ সেপ্টেম্বর ঐ ছবিসহ 'মহব্বত' নামে আরও একটি ছবি দেখেন।

খাজা শামমুল হক পিকচার হাউজে 'দি ম্যাডগার্ল' নামে একটি ছবি দেখেন ১৯২৮ সালের ৮ অক্টোবর রাতে। ৩ ডিসেম্বর রাতে তিনি দেখেন 'আনারকলি' নামে ছবি একই হলে।

১৯২৯ সালের ১২ জানুয়ারি রাতে খাজা শামসুল হক পিকচার হাউজে দেখেন 'দি কুইন ওয়াজ ইন দি পার্লার' বায়োস্কোপ। ১৬ জনুয়ারি তিনি সিনেমা প্যালেসে (বর্তমান রূপমহল) দেখেন 'ডন জুয়ান' নামে ইংরেজি ছবি। ৭ সেপ্টেম্বর রাতে পিকচার হাউজে দেখেন 'কলেজিয়ান' নামে একটি ছবি এবং এর পরদিন (৮ সেপ্টেম্বর) রাতে এম্পায়ার থিয়েটারে (বর্তমান আজাদ) দেখেন 'দি প্রিন্স স্টুডেন্ট' নামে বায়োস্কোপ।

খাজা শামসুল হক ১৯২৯ সালের ১৪ সেপ্টেম্বর রাতে 'পিকচার হাউজে দেখেন 'দি পাঞ্জাব মেইল' ছবি। এই ছবিটি তিনি ও অন্যান্য মিলে দেখেন ১৭ সেপ্টেম্বর রাতেও।

ঢাকায় চার্লি চ্যাপলিনের ছবি প্রদর্শনের খবরও পাওয়া যায় খাজা শামসুল হকের ডায়েরিতে। তিনি ১৯২৯ সালের ২৫ সেপ্টেম্বর রাতে চ্যাপলিনের ছবি দেখেন পিকচার হাউজে। তবে নামোল্লেখ করেননি ৩০ সেপ্টেম্বর রাতে তিনিও খাজা হামিদুল্লাহ এম্পায়ার থিয়েটারে (আজাদ) 'হাওয়াবীর' নামে বায়োস্কোপ দেখেন।

ঢাকায় প্রথম টারজন ছবি প্রদর্শনের খবরও রয়েছে। খাজা শামসুল হক 'টারজান দি মাইটি' ছবি দেখেন ১৯২৯ সালের ৬ অক্টোবর রাতে পিকচার হাউজে। ৭ অক্টোবর তিনি ও খাজা হামিদুল্লাহ এমপায়ার থিয়েটারে (আজাদ) দেখেন 'গ্যাটবুট অ্যান্ড জেরিন' ছবি। ৮ অক্টোবর রাতে খাজা শামসুল হক ও অন্যান্য মিলে আবার দেখেন 'টারজান' তারা ১১ অক্টোবর রাতে পিকচার হাউজে 'টারজান' (দ্বিতীয় পর্ব) দেখেন। শামসুল হক ১৯২৯ সালের ৩০ নভেম্বর পিকচার হাউজে দেখেন 'ফ্লাইং প্রিন্স'। তার সঙ্গে ছিলেন খাজা হামিদুল্লাহ।

১৯৩০ সালের ৬ জানুয়ারি খাজা শামসুল হক 'টারজান লিজিয়ন' ছবি দেখেন পিকচার হাউজে। তিনি একই হলে ৮ জানুয়ারি দেখেন 'বর্ডার ক্যাভেটিয়ার অ্যান্ড গ্যালপিং ফেইরি টুগেদার উইথ কংগ্রেস ফিল্ম অব লোটাস'।

খাজা শামসুল হক ১৯৩০ সালের ১৬ জানুয়ারি রাতে পিকচার হাউজে 'ব্রেকফাস্ট বিফোর সানরাইজ' ছবি দেখেন। ২০ জানুয়ারি রাতে দেখেন 'টেম্পো টেম্পো' নামে ছবি একই হলে

১৯৩০ সালের ২৪ অক্টোবর শুক্রবার সন্ধ্যায় খাজা শামসুল হক লায়ন হলে 'থ্রো অব ডাইস' ছবি দেখেন তার সঙ্গে ছিলেন খাজা হামিদুল্লাহ। ছবিটি ছিল বেশ কৌতুকপূর্ণ ও আকর্ষণীয়। ১ নভেম্বর তিনি পিকচার হাউজে দেখেন 'ব্রডওয়ে' নামে একটি ছবি। ১৫ নভেম্বর এ হলেই 'ফাদার ইন্ডিয়া' ২২ নভেম্বর 'দি চ্যালেঞ্জ' ছবি দেখেন।

খাজা শামসুল হক ৩০ ডিসেম্বর লায়ন হলে সন্ধ্যা ৬টার শোতে দেখেন 'দো পাঁচ' ছবি এবং রাত সোয়া ৯টার সময় পিকচার হাউজে পরিবারের কয়েকজনকে নিয়ে দেখেন 'আলাদিন এ্যান্ড ওয়ান্ডারফুল ল্যাম্প' ছবি।

১৯৩০ সালের ৩১ ডিসেম্বর সন্ধ্যায় খাজা শামসুল হক লায়ন হলে দেখেন 'হার্ট অব নিল' ও 'হুট গিবসন' নামে দুটো ছবি।

খাজা শামসুল হক আরও যেসব ছবি দেখেন সেসবের নাম, তারিখ, সময় ও প্রেক্ষাগৃহের নাম নিচে দেয়া হলো :

তারিখ	সময়	হলের নাম	ছবির নাম
১৯৩১			
৭.১.১৯৩১	রাত ৯টা	লায়ন	মতলব কি পাগল

৮.১.১৯৩১	রাত	পিকচার হাউজ	চঞ্চলা নারী
১৪.১.১৯৩১	সন্ধ্যা ৬টা	লায়ন	?
১৭.১.১৯৩১	রাত	পিকচার হাউজ	হুরে পাঞ্জাব
২৩.২.১৯৩১	রাত	পিকচার হাউজ	সিন্দাবাদ দি সেইলর
৯.৩.১৯৩১	রাত	পিকচার হাউজ	জেমিনি অ্যান্ড ক্যাপ্টেন ফিলিপস
১২.৩.১৯৩১	রাত	লায়ন	এমিল গোয়িং অন দি ওয়ে অব হিসলি
১৯.৩.১৯৩১	রাত	পিকচার হাউজ	সাবিত্রী
১৪.৪.১৯৩১	রাত	পিকচার হাউজ	কিং জন (সবাক)
২৮.১১.১৯৩১	রাত	লায়ন	দেবী চৌধুরাণী
১৩.১২.১৯৩১	রাত	লায়ন	হুর-এ মিশর
২২.১২.১৯৩১	রাত	পিকচার হাউজ	বলিদান

১৯৩২ তথ্য পাওয়া যায়নি

১৯৩৩

১৪.২.১৯৩৩	রাত	লায়ন	দি ওয়াইল্ড উলফ
১৫.৫.১৯৩৩	রাত	মতিমহল	ডাকু কি লাড়কি
৩.৬.১৯৩৩	রাত	পিকচার হাউজ	জেহরি সাপ (সবাক)
৭.৭.১৯৩৩	রাত	মতিমহল	একদিনের বাদশা
১০.৭.১৯৩৩	রাত	পিকচার হাউজ	হাতেম তাই (৪র্থ খণ্ড)
১২.১০.১৯৩৩	রাত	মতিমহল	দাগাবাজ আশক
১৭.১৯.১৯৩৩	রাত	মতিমহল	বুলবুলে বাগদাদ
২৬.১০.১৯৩৩	রাত	মতিমহল	দওলাতকা নাশা
২৮.১১.১৯৩৩	রাত	লায়ন	কবি বীণা
২.১২.১৯৩৩	রাত	মতিমহল	আলেফ লায়লা

১৯৩৪

২২.১.১৯৩৪	সন্ধ্যা	মতিমহল	আফজাল
২৯.১.১৯৩৪	সন্ধ্যা	মতিমহল	জেহরে ইশক
১৩.২.১৯৩৪	সন্ধ্যা	মুকুল	কিং কং
১৫.৩.১৯৩৪	রাত	মুকুল	টারজান দি অ্যাপম্যান
২৭.৩.১৯৩৪	?	মতিমহল	মিস ১৯৩৩
৩০.৩.১৯৩৪	রাত	মুকুল	ইহুদি কি লাড়কি
২.৪.১৯৩৪	রাত	পিকচার হাউজ	লাল-ই-জমিন
১২.৪.১৯৩৪	রাত	?	দি এডুকেডেট ওয়াইফ (সবাক)
২৮.৪.১৯৩৪	রাত	মতিমহল	হিন্দুস্তান (সবাক)
১১.৫.১৯৩৪	সন্ধ্যা	মতিমহল	ভোলা শিকারী (সবাক)

১৭.৫.১৯৩৪	রাত	মতিমহল	কিসমত কি হটাওলে (সবাক)
২৪.৫.১৯৩৪	রাত	মতিমহল	শের দাসুরলে
১৭.৮.১৯৩৪	সন্ধ্যা	মতিমহল	শেরে খুদা (টকি)
৭.১০.১৯৩৪	রাত	মতিমহল	গাফিল মুসাফির
১১.১০.১৯৩৪	রাত	পিকচার হাউজ	মায়া বাজার
৫.১১.১৯৩৪	রাত	?	জঙ্গে আজাদী
৩০.১১.১৯৩৪	রাত	পিকচার হাউজ	ইনসান আওর শয়তান (সবাক)
১.১২.১৯৩৪	রাত	মতিমহল	মমতাজ বেগম (সবাক)
১৪.১২.১৯৩৪	রাত	পিকচার হাউজ	কিং কং (টকি)
১৯৩৫			
২৪.১.১৯৩৫	রাত	মতিমহল	নন্দ ভাওজাই
১৯৩৬			
১.৪.১৯৩৬	?	লায়ন	পিয়া পিয়ারে
৫.৪.১৯৩৬	সন্ধ্যা	লায়ন	পিয়া পিয়ারে
১৬.৬.১৯৩৬	সন্ধ্যা	রূপমহল	বোম্বাইকা বিল্লি
১৭.৬.১৯৩৬	সন্ধ্যা	পিকচার হাউজ	জওয়ানী কি হাউসা
২৮.৬.১৯৩৬	?	লায়ন	?
৯.৭.১৯৩৬	রাত	পিকচার হাউজ	সিলভার কিং
২০.৭.১৯৩৬	?	লায়ন	মিসেস আয়োনমা
৩০.৭.১৯৩৬	?	লায়ন	হিলালে ঈদ
২.৮.১৯৩৬	?	পিকচার হাউজ	ট্রেডার্স হর্ন
৪.৮.১৯৩৬	?	লায়ন	?
৭.৮.১৯৩৬	?	পিকচার হাউজ	শহুরে জাদু
৩১.৮.১৯৩৬	?	লায়ন	কামাইয়া কিরকি
১৯৩৭			
১৬.১.১৯৩৭	রাত	রূপমহল	কিমতি আঁসু
২৬.১.১৯৩৭	রাত	পিকচার হাউজ	আন্ডার সি কিংডম
১৯.২.১৯৩৭	?	পিকচার হাউজ	ফ্যাটাল নাইট
২২.২.১৯৩৭	সন্ধ্যা	রূপমহল	অমর জ্যোতি
২৮.৩.১৯৩৭	?	?	টকি অব টকি
৬.৪.১৯৩৭	সন্ধ্যা	মেট্রো (কোলকাতা)	থ্রি স্মার্ট গার্লস ও টেলিভিশন
৯.৪.১৯৩৭	সন্ধ্যা	প্যারাডাইস (কোলকাতা)	অচ্ছ্যুৎ কন্যা
২৫.৪.১৯৩৭	সন্ধ্যা	মতিমহল	লাইনুন নাহার
৩০.৪.১৯৩৭	সন্ধ্যা	লায়ন	হিন্দ কিশোরী

১.৭.১৯৩৭	রাত	লায়ন	সায়েদ হাওয়া
৪.৭.১৯৩৭	রাত	রূপমহল	অবচ্ছ্যুৎ কন্যা
১৮.৯.১৯৩৭	?	রূপমহল	কুইন অব দি জাংগল

১৯৩৮-তথ্য পাওয়া যায়নি

১৯৩৯

৭.২.১৯৩৯	রাত	প্যারাডাইস	জেইলার
২.৪.১৯৩৯	?	প্যারাডাইস	পোস্টম্যান
৮.৪.১৯৩৯	?	প্যারাডাইস	বাসন্তী
২৫.৪.১৯৩৯	রাত	প্যারাডাইস	বাগান
১.৫.১৯৩৯	রাত	প্যারাডাইস	খান বাহাদুর
৭.৫.১৯৩৯	?	রূপমহল	?
১৪.৬.১৯৩৯	রাত	প্যারাডাইস	বিধবা কুমারী
২৬.৬.১৯৩৯	রাত	প্যারাডাইস	নাদিরা
১.৭.১৯৩৯	রাত	রূপমহল	ভাবী
৫.১০.১৯৩৯	?	রূপমহল	মাদার ইন্ডিয়া
৭.১০.১৯৩৯	রাত	তাজমহল (নতুন হল)	দি কিক

কাজী শামসুল হকের দেখা চলচ্চিত্র

ঢাকার আশেক জমাদার লেনস্থ ঐতিহ্যবাহী কাজী পরিবারে কাজী শামসুল হকের জন্ম ১৯০৮ খ্রিস্টাব্দে। মুসলিম হাইস্কুল ও ঢাকা কলেজে তিনি লেখাপড়া করেন ঢাকা কলেজে তার সহপাঠী ছিলেন বুদ্ধদেব বসু কাজী শামসুল হক বিএ পর্যন্ত লেখাপড়া করেন পরে তিনি সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। ১৯৬৩ খ্রিস্টাব্দে তিনি চাকরি থেকে অবসর নেন ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে।

সেকালের ঢাকার সমাজ, সংস্কৃতি, ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহের সূত্রে কাজী শামসুল হকের সঙ্গে ১৯৯১ সালের ৩১ জুলাই প্রথমবার সাক্ষাৎ করি তার ৫/২ হেয়ার স্ট্রিটস্থ এপার্টমেন্টে। এরপর আরো কয়েকদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করি এবং তার লেখা ব্যক্তিগত ডায়েরি থেকে অনেক তথ্য সংগ্রহ করি। তিনি প্রায় নিয়মিত ডায়েরি লিখতেন।

জনাব হক জীবনে প্রথম চলচ্চিত্র দেখেন আরমানীটোলাস্থ পিকচার হাউজে (বর্তমানে শাবিস্তান)। ১৯২৪-২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি এ হলেই প্রথম নির্বাক চলচ্চিত্র দেখেন। পরবর্তীকালে চলচ্চিত্রের প্রতি তার আকর্ষণ প্রবল হয়ে ওঠে। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ থেকে তিনি নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র দেখা শুরু করেন। চলচ্চিত্র দেখার পাশাপাশি তার আরো একটি অভ্যাসে পরিণত হয় চলচ্চিত্র ও শিল্পীদের নাম ডায়েরিতে লিখে রাখার। তবে ডায়েরিতে তিনি কোনো তারিখ এবং সব হলের নাম লিখেননি। শুধু উল্লেখ

করেছেন সালের কথা। ১৯২৬ খ্রিস্টাব্দ হতে তিনি নিয়মিতভাবে চলচ্চিত্র দেখা শুরু করলেও ডায়েরিতে নির্দিষ্ট করে ছবির নাম আছে ১৯২৯ সাল থেকে। নিচে তাঁর দেখা উল্লেখযোগ্য চলচ্চিত্রের বিবরণ দেয় হলো :

১৯২৪ থেকে ১৯২৮ খ্রিঃ

ছবির নাম		প্রেক্ষাগৃহ
দি হোয়াইট রোজ	নির্বাক	পিকচার হাউস
আদুরে ছেলে	"	"
ফান ফ্রাইডে	"	"
দি পিলগ্রিম	"	"
দি লিটল অ্যামেরিকান	"	"
ইন্ডিয়ান কুইন	"	"
এক্সকিউজ মি	"	"
দি রোজেস অব পিকাডেলি	"	"
ক্যাসানোভা	"	"
প্যালেসেস	"	"
নর্থ অব থারটি সিক্স	"	"
দি থিফ অব বাগদাদ	"	"
দি ব্ল্যাক প্রাইড	"	"
থ্রি মাসকেটিয়ারস	"	"
ডন কিউ সন অব জরো	"	"
দি মার্ক অব জরো	"	"
রবিনহুড	"	"
দি ফোর হর্স মেন এপোক্লিস	"	"
দি সন অব শিব	"	"
মসিয়ে বুকালো	"	"
দি শেখ	"	"
দি সি উলফ	"	"
এসেজ অব ভেনগিয়েন্স	"	
চার্লস আন্ট	"	"
দি গার্ল কারপেট মেকার অব বাগদাদ	"	"
দি সিনে-ফ্লাড	"	"
দি ক্যাট এন্ড ক্যানারি	"	"
পোকার ফেস	"	"

কোহান অ্যান্ড কেলার		
দি অরিয়েন্টাল লাভ	"	"
স্যামসন অব দি সার্কাস	"	"
দি ম্যারিজ ক্রুজ	"	"
সাইরেন অব দি সি	"	"
লরেন অব দি লায়ন	"	"
দি ড্যান্সার অব দি নাইল	"	"
দি গোল্ড রাশ	"	"
দি র‍্যাট	"	"
পেরিনাস অব দি ওয়াইল্ড	"	"
এলেন দি মাইটি		"
দি মিস্ট্রিম্যান		"
নেপোলিয়ন বোনাপার্ট		"
ওথেলো		"
আইভ্যান হো		"
হোয়াই উরি	"	"
আই উইল শো ইউ দি টাউন	"	"
রুপার্ট হ্যান্ডজো	"	"
প্রিজনার অব জেন্দা	"	"
দি বার্থ অব এ নেশন	"	"
সাইমন ডি বেনজ্ঞিবেন	"	"
দি ওয়েজ অব সাইন	"	"
ডাঃ জ্যাক	"	"
মেসিয়াটো ইন হেল	"	"
দি হাঞ্চবেক অব নটারডেম	"	"
দি ফোর ফ্রি ট্রেডার	"	"
হট ওয়াটার	"	"
দি স্টরি অব থ্রি সিস্টার্স	"	"
দি ভেনিটি ফেয়ার	"	"
স্ট্যামপিড টেলগরি	"	"
দি রিডল রাইডার	"	
দি বিলভেড রুগান	"	"
দি সি বিচ	"	"
হোয়াট হ্যাপেন্ড টু জন	"	"

ডেকে'রাম লাইট	"	"
দি সারভাইভ্যাল অব এ স্পট বয়	"	"
সোল ফর সেল	"	"
দি অাইস ফ্লাড	"	"
দি ওয়ে ডাউন ইস্ট	"	"
দি পাইরেট	"	"
অনকভারড ওয়াগেন	"	"
দি ফ্যান্টম অব দি অপেরা	"	"
মেরি গোরউন্ড	"	"
দি মিডনাইট সান	"	"
ইকোস অব দি সাউথ সি অাইল্যান্ড	"	"
দি স্টোরি অব দি সুইস ফেমিলি	"	"
সুলতান সালাউদ্দিন	"	"
হোয়ার ওয়াজ আই	"	"
দি এটারনেল সিটি	"	"
দি লাস্ট ডেজ অব পমপাই	"	"
দি কিড	"	"
দি ডায়মন্ড কুইন	"	"
দি কুয়াভেদিস	"	"
সোল ফায়ার	"	"
দি রেড সি	"	"
প্যাক সু বেড বয়	"	"
গার্ল শাই	"	"
এনিমিজ অব ওমেন	"	"
ক্যাপটেন ব্লাড	"	"
হেল বাই দি বস	"	"
হোল্ড ইউর ব্রেথ	"	"
রোজিটা	"	"
দি ডেভিল জ্যাক	"	"
টেস অব দি স্ট্রম কান্ট্রি	"	"
মাতৃস্নেহ	"	"
পতিভক্তি	"	"
বিষ বৃক্ষ	"	"
কংসবধ	"	"

গোল্ডেন আইরিস	"	"
বিলাত ফেরত	"	"
কৃষ্ণ সখা	"	"
শিরি ফরহাদ		"
গুল সুন্দরী		"
কমলে কামিনী	"	"
জয়দেব	"	"
মনভঞ্জন	"	"
গুলে বাকাউলি	"	"
নিরো	"	"
হু ইজ হু	"	"
হোয়েন প্যারিস স্লিপস	"	"
স্পেনিস ড্যান্সার	"	"
আলাদীন ও আশ্চর্য প্রদীপ	"	
দি সার্কাস	"	"
দি সরো অব স্যাটান	"	"
আলী বাবা	"	"
দি ফ্লাইট লেঃ	"	"
পাপের পরিণাম	"	"
দ্যাট ইজ মাই ড্যাডি	"	"
গুলে সানোয়ার	"	"
নিষিদ্ধ ফল	"	"
দি লেডি অব দি হারেম	"	"
ম্যান'স পাস্ট	"	"
ডরোথি ভারনম অব হেভেন হল	"	"
স্পোর্টি লাইফ	"	"
স্পোর্টি ইউথ	"	"
ভ্রান্তি	"	"
হার নাইট অব রোমান্স	"	"
প্রেম পাগলিনী	"	"
স্কাই হাই	"	"
দি নাইট অব লাভ	"	"
হি হু গেটস স্লিপ	"	"
সেকেন্ড টু নান	"	"

সো দিস ইজ ম্যারেজ	"	"
থ্রো দি ফ্লেইম	"	"
জনি গেট ইউর হেয়ার কাট	"	"
দি গ্রেটার গ্লোরি	"	"
দি চাইনিজ পেরেন্ট	"	"
বেনহুর	"	"
আনারকলি	"	
কৃষ্ণকান্তের উইল	"	"
দি ডার্ক অ্যাঞ্জেল	"	"
দি মিসিং অব বারবারা ওয়াট	"	
ভেন্ডেলাম	"	"
মাইম্যান	"	"
সরলা	"	"

কাজী শামসুল হকের দেখা অন্যান্য চলচ্চিত্র :

১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ (বিভিন্ন প্রেক্ষালয়ে) : ইন্দ্রসভা, টেল ইট টু দি জুলিয়ানা, অল এব্রোড, পাপেট, সেফটি ফার্স্ট, সোলজার আর্মস, দি স্পোর্টিং ভেনাস, গ্রাম্যবালা, ডন জুয়ান, দি কুইন ওয়াজ ইন দি পার্লার, সিলকি স্টকিং, আংকল টমস কেবিন, দুর্গেশনন্দিনী, ম্যায় বেম্বেটে, ক্যামেলিয়া, ভারদিসিয়া, দি ইনগ্রেস, টেম্পরারি হাজবেন্ড, কিড ব্রাদারস, মমতাজ মহল, ফ্রেম, দি পিকচার ইন দি পেপার, দি ওয়ে অব অল ফ্লেস, দি স্টোলেন ব্রাইড, দি সোল অব ফরগটেন ওমেন, দি আউল, হোয়েন এ ম্যান লাভ, হিজ সুপ্রিম ইভেন্ট, লাফ ক্লাউন লাফ, দি ওয়েডিং মার্চ, লাভ মি অ্যান্ড ওয়ার্ল্ড ইজ মাইন, বেথোস, গুড মর্নিং জাজ, দি গার্ডেন অব আল্লাহ, স্পিডি, স্কারটস, দি ডাচেস অব বাফেলো, দি প্রাইড অব হেভেন, দি উইনিং সেক্স, দি ওয়ান্ডারিং গার্ল, দি মেরি উইডো, হাউজ ক্লিনিং অ্যান্ড দি সেফ ডাউন, দি স্টিমবোট বিল, দি ম্যাজিক, অ্যাক্রস টু সিঙ্গাপুর, প্যাগান, দি ম্যান হু লাফ, মেট্রোপলিস, কোহান অ্যান্ড ফিলিপ ইন প্যারিস, তরুণ ভারত, সিরাজ, দি ডেভিল সার্কাস, দ্যাট সারটেন থিংস, জেরাল্ড অ্যাস্টন লেডি, এন অ্যাফেয়ার অব ফলি, ইট, দি কোজাক্স, বেস্ট গার্লস, আয়েশা, মেল গোয়িং, দি ইনভিনসিবল, লাকি মেরি, স্নেহ জ্যোতি, মাই অফিসিয়াল ওয়াইফ, নার্স, ম্যানহ্যাটান ককটেল, ক্যামিও কারভি, কারনিভাল অব ভেনিস, ফ্লাইট কমান্ডার, দি ফরচুন হান্টার, দি পেটেন্ট লেদার কিট, রেড হ্যাক্টর, লন্ডন আফটার মিডনাইট, দি লাস্ট ওয়ার্নিং, লিজিয়ন অব দি কনডেমড, রুকিস, লাভ অব অ্যান অ্যাকট্রেস, উইমস, ফ্লাইট প্রিন্স, ফ্লেস অ্যান্ড ডেভিল, স্বামী ও স্ত্রী, দি বিগ প্যারেড, লিটল এমি রনি।

১৯৩০

ফরেন লিজিয়ন, পেট সি, টেম্পো টেম্পো, ইয়োলো লিলি, ড্রেস মেকার্স ফ্রম প্যারিস, দি ব্ল্যাক ঈগল, প্রেমের প্রতিমা (১০ মার্চ, লায়ন থিয়েটার), ওহ! হোয়াট এ নাইস!, বারডুন, ক্যাপটেন সোয়েঙ্গার, বিফোর মিডনাইট অ্যান্ড ফোরফুটেড ভালগার, ভার্সিটি গার্ল, ব্যাচেলর ক্লাব, দি রেভাইন অব ডেজ, ইন্দিরা (সুলোচনা), হাউ টু হ্যান্ডেল উয়োম্যান, রজনী (লীলাবতী, মনোরঞ্জন, দুর্গাদাস), হাসিনা অর আই ফর আই, দি ওম্যান ফ্রম মস্কো, প্যারিস (জোয়ান ক্রফোর্ড), ভিক্ষুক (গওহর), দি গ্রেট ট্রেন রবারি, ওয়ান্ডারফুল প্রিন্স, বেভারলি অব গ্রামস্টার্ক, র‍্যামেল, দি ওয়ে অব এ গার্ল, দি ওমেন ডিসপুটেড, হি গোজ টু ওয়ার, দি অনহেলি নাইট, দি রেকলেস স্পিড, দি ভয়েস অব কনসায়াস, ইটারনেল লাভ, দি পাইরেট, এ সারটেন ইয়ংম্যান, হারানো কংকন (জোবায়দা), দি ওয়াল স্ট্রিট, দি সাইলেন্ট কমান্ড, কপালকুণ্ডলা, ফিটারস, টু ইনফরমাল ডেজ, দি অয়রন মার্কস, সার্কাস উইলসন, রাজপুতানি (সুলোচনা), ভারত রমণী (সীতাদেবী), রাজপুতানী বা হংসকুমারী, দি সিংগিং কাউল, ম্যানন লেসকট, বুলবুলে পরীস্থান, শাহজাদী (জোবায়দা, ফাতেমা), স্মল ব্যাচেলর, লোন ঈগল, নূরে দক্ষণ, সানরাইজ, জাজ হেভেন, দি ডেজ অব ফরটি নাইন, আওয়ার মডার্ন মেশিন, ফায়ারম্যান, গডলেস গার্ল, মিসটিরিয়াস লেডি, ব্লকেড, চিতোর পদ্মিনী (রমলা, রাধা), ব্যাটল অব দি সেক্সেস, পাতাল পদ্মিনী (জেবুন্নেসা, রানীবালা), বিওবেটা, অল অ্যাট সি।

১৯৩১

দি ফ্লাইং ফ্লিট, দি ডেঞ্জারাস ওয়োম্যান, গ্লোরি অব ইন্ডিয়া, বিগ্রহ বা গডডেস ইমেজ, দি স্কারলেট লেটার, দি ড্যান্স অব লাইফ, মকারি, দি লেডি অব চান্স, কণ্ঠহার, (সবিতা দেবী), দেবদাস, টেমিং অব দি শ্রু, হোয়াইট শ্যাডো ইন দি সাউথ সি, দি প্যাট্রিয়ট, দি অ্যাকট্রেস, মাধুরী (সুলোচনা), দি কিং অব জাজ, ধূমকেতু, রিভেঞ্জ, বিউ ব্যানডিট (সবাক), সবাক বাংলা সিরিজ, কৃষ্ণচূড়া (সবাক), এনতেকাম, ব্রিংগিং অব ফাদার, হিজ ক্যাপটিভ ওমেন, ক্যাপটেন ফারলো, দি গ্রিন মারডার কেস, স্ট্রিট অ্যাঞ্জেল, এডজুডেন্ট অব দি কেস, হ্যাপিনেস এহেড, ম্যাডোনা অব সেভেন ডেজ লিভ (সবাক), ডেভিল মেক ফেয়ার, টারজন দি টাইগার (সবাক), বীর বালক (সবাক), চিলড্রেন অব দি স্টর্ম, আলম আরা (সবাক), মাদার ইন্ডিয়া, দি লাস্ট কিস (ঢাকার প্রথম নির্বাক ছবি), দি সিনথেটিক সিন, ইন্দিরা (সবাক), টেল ইট টু দি ম্যারিয়েটা, লেডি বে জু, বসন্ত সেনা, দি ক্যামেরাম্যান, গুপ্তরত্ন, কলেজ লাভ, লোন সান, টাইপিস্ট গার্ল, দি উইন্ড, নটি বাট নাইস, হোয়েন সিটি স্লিপস, ব্রেকফাস্ট আফটার সানরাইজ, অদৃষ্ট, স্বামী, রোজ মেরি, অ্যামেরিকান বিউটি, দি সেভেনস হেডেড, ম্যাডাম স্যাটান, দেবী দেবযানী (গওহর), সিটি স্ট্রিট, জামাই ষষ্ঠী, ট্রেডার হর্ন, ফিল মাই পালস, ওয়েটিং নাইট, কারমেন, ওয়ান হিস্ট্রিক্যাল নাইট, হিজ হাইনেস, পত্নী প্রতাপ, ফাইটিং মোবাইল, পরজন্ম, বন গোলাপ, এক্সপ্রেস ব্যাগেজ, গীতা, দি স্টর্ম, অ্যান ওমেন

অ্যাফেয়ার, অল কোয়াইট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট, চাষার মেয়ে, ব্রিটেয়ালা, প্যাগান, বিসর্জন।

১৯৩২

এ বিড ফর এ থ্রোন, বেটার ক্রাই অব সিভিলাইজেশন, ফাউস্ট, ডন অব লাভ, ট্রেইল অব ৯৮,আবু হোসেন, চোরা কাঁটা, টু গার্লস ওয়ান্টেড, ডিনামাইড, দি গ্রিন অব লোর, সাইনস অব ফাদার, ড্র্যাগ, ঋষির প্রেম, সুইট ড্যাডি, আলী বাবা, বিল্বমঙ্গল, ডিউক স্টেপস আউট, এলিভি, শিরি ফরহাদ, দাওলাত কা নেশা, জাস্ট ইমেজিন, স্কিনার স্টেপস আউট, লি রুডল এলিয়াস জিমি ভেলানটিনে, বদমাশ বা রাসকেল, ফেয়ার ডেভিলস, অপরাধী, নট সো ডাম্ব, পুনর্জন্ম, রেনিগেড, ম্যানস ওয়াটার, ইস্ট লাইনার, ওয়ান হেভেনলি নাইট, তৃতীয় পক্ষ, ম্যান হু ক্যামব্যাক, লাভ প্যারেড, গুল বাকাওয়ালী, রোমান্স, দি লোদিং ব্রাইড, ইন ভিসক্রিট, ম্যান উইদাউট ওমেন, মীরাবাঈ, জ্বলতি নিশানি, হুফ, পল্লী সমাজ, সিটি লাইটস, পার্লার, বেডরুম অ্যান্ড বাথ, চিরকুমার সভা, মরক্কো, গার্ডসমেন, কিকি, কংসবধ, ডেঞ্জার আইল্যান্ড

১৯৩৩

স্পাইলিং লেফটেন্যান্ট, চণ্ডীদাস, ইস্ট অব বার্মা, মাতাহারি, ড্যাডি লং লেগস, ওয়াইল্ড উলফ, রিডেমশন, নেক অবলা, সি বেড, পামি ডেইজ, ইনস্পাইরেশন, যমুনা-পুলিনে, জরিনা, ডেভেক, কিং অব দি ওয়ার্ল্ড, লায়লা মজনু, পুরাণ ভকত, গিলটি জেনারেশন, বডি অ্যান্ড সোল, ওয়েলকাম ডেঞ্জার, সাবিত্রী, অলওয়েজ গুডবাই, ডাকু কি লাড়কি, নল দময়ন্তী, সাংহাই এক্সপ্রেস, উবাংগি, অ্যামেরিকান ট্র্যাজেডি, কিং ফর এ ডে, এয়ারমেল মিস্ট্রি, এভেনজিং রাইডার, ওয়ান আওয়ার উইথ ইউ, নৌকাডুবি, পলি অব দি সার্কাস, জয়দেব, চার বদমাশ, ড. জেকেল অ্যান্ড মি. হাইট, মীরাবাঈ, ইউ মেড মি লাভ ইউ।

১৯৩৪-৩৬

ছবির তালিকা সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

১৯৩৭

দি লিটলেস্ট, অমরজ্যোতি, অচ্ছুত কন্যা, মিউটিনি অন দি বুনটি, দস্তর মত টকি, লা মিজারেবল, বিজয়া, টেল অব টু সিটিস, মুক্তিস্নান, জংগল কি রাণী, মুক্তি, প্রেসিডেন্ট।

১৯৩৮

দেশের মাটি, টারজান কা বেটি, অভিনয়, লেটার অব ইন্ট্রোডাকশন, গ্রামোফোন সিঙ্গার, মেরি অ্যান্ড টিনসেড, সাথী, হারিকেন, দুনিয়া না মানে, কেয়ার ফ্রি, বচন, জীবন প্রভাত।

১৯৩৯

সিটাডেল, অধিকার, খনা, বড় দিদি, মঞ্জিল, ওয়াতান, ডিনামাইট, ওয়ে আউট

ইস্ট, ক্যারমেন, পথিক, ভাবী, সাপুড়ে, দুশমন, গুড আর্থ, অ্যাডভেঞ্চার অব মারকোপলো, কিলার কিলার, সিতারা, তরুণী, ক্রুসেডস, চ্যালেঞ্জ, মিঠাজহর, তিনশ' রোজ বাদ, দেবদাসী, টারজান টেকস রেভেঞ্জ, এলিফেন্ট বয়, ইন্টারন্যাশনাল সেটেলমেন্ট, হিমালয় কা বেটি, মাদার ইন্ডিয়া, ঠোকর, পরশমণি, লেডিস ওনলি, নির্মলা, একলব্য, মেনি কুইন, লস্ট হরাইজন, দি রাইস, রিক্তা, রুক্মিনী, হালবাংলা, শর্মিষ্ঠা, সুইস মিস, নবজীবন, গায়েবী সিতারা, জীবন মরণ।

বুদ্ধদেব বসুর দেখা চলচ্চিত্র

বিশিষ্ট কবি বুদ্ধদেব বসুর (১৯০৮-১৯৭৪) স্মৃতিকথায় পাওয়া যায় পুরানো ঢাকার চলচ্চিত্র সম্পর্কে কিছু তথ্য। তিনি বিশের দশকে (১৯২১-১৯৩০) ঢাকায় দেখা 'বায়োস্কোপ' সম্পর্কে লিখেছেন 'আমার ছেলেবেলা' (১৯৭৩) গ্রন্থে। লিখেছেন তিনি :

'ঢাকায় আসার পর– কিছুদিনের মতো– আমি হয়ে উঠেছিলাম বিলকুল একজন সিনেমাখোর, আমার প্রধান প্রিয়স্থান আর্মনিটোলার পিকচার হাউস, শহরের একমাত্র ছবিঘর সেটি।

অর্ধচন্দ্রাকৃতি সাইনবোর্ড, সন্ধ্যের পরে একটি বাল্বে আলো জ্বলে ভেতরটা খুব খোলামেলা— জমি, বাগান, বাড়ি, চলার রাস্তা, একপাশে টবের গাছ অনেকগুলো— সেখানে বেতের চেয়ারে বসে মাঝে মাঝে আড্ডা দেন মালিক ও তার বন্ধুরা। চিত্রশালাটি চটকদার নয়— লম্বা ছাদের গুদোমের মতো গড়ন, দেয়ালগুলো সাদামাটা চুনকাম করা, টিনের ছাদের তলায় কোনো সিলিং নেই— বসার জন্য চেয়ারমাত্র একসারি, আর আছে তক্তপোশের উপর গদিআঁটা চেয়ারে দুটি 'বক্স'— অত্যধিক মূল্যবান বলে খালি পড়ে থাকে সেগুলো অথবা পাস নিয়ে ভাগ্যবানেরা আসেন। পালাবদল হয় বুধবারে আর শনিবারে সে দুদিন সকালে একটি ঘোড়ার গাড়ি বেরোয় ছাদের উপরে চলে ব্যাগপাইপ আর ঢাকের বাদ্যি আর ভেতরে বসে দুটি লোক মুঠো মুঠো ছড়িয়ে যায় বাংলায় আর ইংরেজিতে ছাপা হলদে লাল সবুজ কাগজে হ্যান্ডবিল ঢাকের শব্দে ছুটে যাই আমি রাস্তায়, বিজ্ঞাপনের রগরগে বিশেষণগুলোয় আবার মনে নেচে ওঠে। আমি পারতপক্ষে একটা পালাও বাদ দিই না। প্রয়োজনীয় সিকিটি জোটাতে একেক সময় বেশ বেগ পেতে হয়। আর সেই সিকির বিনিময়ে যেখানে ঢুকি, সেটাও এক আজব দেশ।' (পৃ. ৮৮-৮৯)।

বুদ্ধদেব বসু আরো লিখেছেন, 'প্রায়ই চলে ধারাবাহিক ছবির পালা, ডনকুস্তি লম্পঝম্প জমজমাট। বীর এডিপলো, বলবান এল্লো লিংকন, আর অবশ্য অরণ্যবাসী মহান টার্জান— এদের হাজার বিজয়ী রোমাঞ্চ-সিরিজ আমি অনেক দেখেছি লম্বা টুলে ঘেঁষাঘেঁষি বসে। কখনো বা দেয়ালে ঠেশান দিয়ে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে— আমার কানে অর্গান আর বেহালার বাজনা। আমার নাকে বিড়ির ধোঁয়ার ঘন গন্ধ— যার উৎস আমার চার-আনা মহলের প্রতিবেশীরা। ঢাকার চলতি ভাষায় যাদের বলা হয় 'কুট্টি'—

গাড়োয়ান, ফেরিওলা, বাখরখানিওলা, রাজমিস্ত্রি এমনি সব তারা ইংরেজি অক্ষর চেনে না, জানে না কোথায় আফ্রিকা বা আমেরিকা, কিন্তু সবচেয়ে সহৃদয় আর সরব দর্শক তারাই— ঠিক বুঝে নেয় কোথায় কী হচ্ছে এবং কেন হচ্ছে। সারাক্ষণ মন্তব্য ছুঁড়ে দেয় ফিল্মের লোকগুলোর দিকে সময় বুঝে 'আবে! মার্দিশ!' বলে চেঁচিয়ে ওঠে, যৌথভাবে হাততালি দেয়, নায়কের শত্রুপক্ষীয় ষণ্ডাগুলোর মুণ্ডুপাত করে— আর শেষ ক্লোজআপ চুম্বনের সময় তাদের শিসের শব্দে তীক্ষ্ণ উল্লাস আলো জ্বলার পরেও থামতে চায় না। পিকচার হাউসের ভেতরটার কথা উঠলেই আমারমনে পড়ে এই 'কুট্টি' সম্প্রদায়কে— লুঙ্গি আর রঙিন গেঞ্জি পরনে, মুখে রসিকতার ফুলঝুড়ি, শপথ-বুলিতে চ্যাম্পিয়ন, ভাঙা উর্দু আর খাস ঢাকাই বাংলা মেশানো যাদের মুখের ভাষা গাড়োয়ানের হাতে চাবুকের শব্দের মতোই কনকনে আর বাইরে থেকে যাদের দেখে মনে হয় জাত-বোহেমিয়ান, কলকের জন্য কোনো মাথা-ব্যথা নেই, ফুর্তির ফেনা ছিটোতে ছিটোতে ভেসে চলেছে সারাক্ষণ।' (পৃ. ৮৯-৯০)।

কি ধরনের ছবি দেখেছেন তিনি পিকচার হাউসে? এ সম্পর্কে তিনি লিখেছেন : '(পালোয়ানি ফিল্ম ছাড়া) কখনো আসেন মেকআপ জাদুকর লন চ্যানি তার কারুণ্য নিয়ে, আবির্ভূত হন বিশ্বমোহিনী ম্যারি পিকফোর্ড, ক্যাথিড্রেলের ঘড়ির কাঁটা ধরে হ্যারল্ড লয়ডকে শূন্যে ঝুলে থাকতে দেখা যায় আর মাঝে মাঝে 'তৎসহ দুইখণ্ড কমিক' বলে বিজ্ঞাপিত ছোটে ছবিতে আমি দেখতে পাই অসাধঅরণ এক মুখ, এক মানুষ, এক চরিত্র— ছোট্ট গোঁফ, বেঢপ জুতো, ঢোলা পাৎলুন আর হাতে একটা ছড়ি নিয়ে যিনি চোখে ঠোঁটে গালে কাঁধে চলার ভঙ্গিতে কথা বলেন, ছড়িয়ে দেন বেদনা-মেশানো কৌতুক নিজেকে নিজে ঠাট্টা করে যেন হাসির অছিলায় হৃদয় ছুঁয়ে যান। আর তারপর একদিন ছোট ছেলে জ্যাকি কুগানের সঙ্গে একটা লম্বা ফিল্মে দেখলাম তাকে। তিনি আমাকে জয় করে নিলেন।' (পৃ. ৯০)। (সূত্র : আমার ছেলেবেলা, কলিকাতা, ১৯৭৩)

ভবতোষ দত্তের দেখা চলচ্চিত্র

বিশিষ্ট ভারতীয় অর্থনীতিবিদ সিলেটের ভবতোষ দত্ত (জন্ম ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে পাটনায়, মৃত্যু : ১৯৯৭) ১৯২২ খ্রিস্টাব্দে ঢাকায় আসেন। পরিবারের সাথে ওয়ারীতে থাকতেন পড়তেন ঢাকা কলেজিয়েট স্কুল ও জগন্নাথ কলেজে। ঢাকায় ছবি দেখা সম্পর্কে লিখেছেন তিনি :

'যখন স্কুলে পড়ি তখন সারা শহরে একটি মাত্র সিনেমা ছিল, আর্মানিটোলার 'পিকচার হাউস' লম্বা গুদামের মতো টিনের চালা দেওয়া ঘর। চার আনার সিটে ছারপোকা অধ্যুষিত বেঞ্চ, আট আনার সিটে বেঞ্চ-ই কিন্তু তাতে হেলান দেবার ব্যবস্থা ছিল। ছবি আরম্ভ হবার আগে কনসার্ট বাজতো। আবার বাজতো ইন্টারভ্যালের সময়। প্রত্যেক রিল শেষ হলে আলো জ্বলে উঠতো। কারণ একটিমাত্র প্রজেক্টরে রিল বদল করতে সময় লাগতো ইংরেজি ছবিই বেশি এবং এর মধ্যে থাকতো 'ফুল সিরিয়াল'—

এডিপোলো, এলমো দ্য মাইটি, স্যানসোনিয়া, টারজান— দু-তিনটি কিস্তিতে দেখানো হতো। ডগলাস ফ্যারার ব্যাংকসের ছবিটি দেখানো হলে ভিড় উপচে পড়তো।

উৎসাহের জোয়ার উঠতো বাংলা টাইটেল দেওয়া ছবি দেখানো হলে। শহরের সব পাড় থেকে ঘোড়ার গাড়ি করে, আশপাশের গ্রাম থেকে— এপাড়া হইতে আয় মায়ে ঝিয়ে, ও পাড়া হইতে আয় খেয়া দিয়ে— অগুনতি লোক আসতো 'কমলে কামিনী' বা 'পতিভক্তি' দেতে। সপ্তাহান্তে ঘোড়ার গাড়িতে বাজনা বাজিয়ে পাড়ায় পাড়ায় হ্যান্ডবিল দিয়ে যেত 'আরো এক সপ্তাহ'। পরের সপ্তাহের শেষে বলা হলো 'ঢাকাবাসীর বিশেষ অনুরোধে আরো এক সপ্তাহ'। তারপরে শেষ রজনী, তারপরে নিতান্তই শেষ রজনী। একবার 'শেষ' এবং 'শেষেরও শেষের' পরে হ্যান্ডবিল পাওয়া গেল 'বিদায় নিয়ে গিয়েছিলাম, ভেবেছিলাম ফিরব নারে, এইতো আবার নবীন বেশে ফিরে এলাম হৃদয় দ্বারে। সম্পূর্ণ নতুন প্রিন্ট, আবার দেখুন। সব ছবি নির্বাক— খানিকক্ষণ পরে পরে পর্দার উপরে ফুটে উঠে কথাবার্তার কোনো অংশ। আর সব দর্শক সমস্বরে সেটা পড়ে যায়। হলঘর মুখর হয়ে ওঠে। পরে আরো দুটি সিনেমা গৃহ স্থাপিত হয়। আমরা অবশ্য বলতাম বায়োস্কোপ।' (সে নামটা কোথায় গেল?)। (সূত্র : আট দশক, কলকাতা, ১৯৯১,পৃ. ৪৮-৪৯)।

যোবায়দা মির্যার দেখা চলচ্চিত্র

বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, সংস্কৃতি অনুরাগী যোবায়দা মির্যা ঢাকায় ত্রিশের দশকে অনেক চলচ্চিত্র দেখেছেন তাঁর দেখা বিভিন্ন চলচ্চিত্র সম্পর্কে জানা যায় তার নিজেরই লেখা হতে। উল্লেখ্য, যোবায়দা মির্যার জন্ম ঐতিহ্যবাহী কাজী পরিবারে। তাঁর পিতা বিশিষ্ট অধ্যাপক পরিসংখ্যানবিদ, দাবাড়ু, লেখক এবং কাজী নজরুল ইসলামের বন্ধু ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেন। যোবায়দা মির্যা মারা গেছেন। নিচে তঁর দেখা ছবির বিবরণ দেয়া হলো :

'আমাদের ছেলেবেলায়, অর্থাৎ আমি যখন স্কুলে পড়তাম তখন, মুসলমান মেয়েদের সিনেমা দেখার সুযোগ বিশেষ ছিল না। তার প্রধান কারণ পর্দার কড়াকড়ি হয়তো ক্বচিৎ দু'একটি মেয়ে যেতো ছবি দেখতে, তাদের বিয়ের পরে, ঘোড়া-গাড়ির জানালার সব কটা খড়খড়ি তুলে বন্ধ করে। তখন আর তারা মেয়ে নয়, বৌ-কিন্তু বৌরা ক'দিনই বা নতুন থাকে! 'নতুন নতুন তেঁতুলের বীচি, পুরোন হলেই বাতায় গুঁজি।' তারা যা দেখতো তাকে বলতো বায়োস্কোপ, সিনেমা নয়।

ত্রিশের দশকের প্রথম দিকে ঢাকায় সিনেমা হল ছিল মাত্র দুটি— মুকুল আর মোতিমহল। সে সময় ছবি ছিল নির্বাক। ক্রমশ সবাক চিত্র এলো। তখন মুকলের নাম হলো 'মুকুল টকিজ' সেই মুকুল এখনো আছে— কাচারির উল্টোভাগ ভিক্টোরিয়া পার্কের (এখন বাহাদুর শাহ পার্ক) পাশ দিয়ে কিছুদূর গিয়ে আবার দু'খানা হয়ে একটা গেছে লক্ষীবাজার আরেকটা দিগ বাজার— বাংলাবাজার; মুকুলের সামনে দিয়ে আরো

দুটো রাস্তা বেরিয়েছে— একটা বাহাদুর শাহ পার্কের আরেক পাশ দিয়ে ইসলামিয়া হাইস্কুল ঘেঁষে সদরঘাটের দিকে, অন্যটা কাচারির পাশ দিয়ে ইসলামপুরের দিকে চলে গেছে। এই চৌরাস্তার মোড়ে দারুণ ভিড় যে রাস্তাটা সদরঘাটে, একেবারে বুড়িগঙ্গা নদীর ধারে ওয়াইজঘাট পর্যন্ত গিয়ে থেমেছে তারই শেষ মাথায় ডান ধারে ছিল ইডেন গার্লস হাইস্কুল অ্যান্ড ইন্টারমিডিয়েট কলেজ। বাঁ ধারে মোতিমহল সিনেমা হল। ঠিক যেখানটা সিনেমা হলের মেইন গেট সেই বরাবর রাস্তার ওপারে ইডেন কলেজেরও একটা গেট ছিল। এটা প্রায় সব সময় বন্ধ থাকতো। কৃচিৎ কখনো ('৩১-৩২ সালে) আমাদের নিয়ে যাওয়া হতো, এই গেট খুলে, মোতিমহলে সরকারি প্রচারণাভিত্তিক বায়োস্কোপ দেখতে— বিষয় কলেরা, বসন্ত, মশা, মাছি, যক্ষ্মা ইত্যাদি। সেসব ভালো করে মনে নেই, কারণ কথা তো শুনতে পেতাম না। পর্দার ওপর লিখে দিতো বটে, কিন্তু সে লেখাগুলো এমন ঝটপট পাল্টে যেতো সাধ্য কার যে পড়ে! শুধু দ্রুত পরিবর্তনশীল চলমান ছবি দেখে যেটুকু বুঝতাম তাই কি আর এতদিন মনে থাকে! তবু একটা দুটো মনে আছে। পরিচ্ছন্নতা সম্বন্ধে একটা ছবিতে দেখেছিলাম— কাঁচা পায়খানায় অসংখ্য মাছি ভিন্ ভিন্ করে বসছে আবার সেখান থেকে উড়ে এসে সোজা বসছে মিষ্টিওয়ালার দোকানের খোলা খাবারের ওপর। দোকানের কারিগর রসগোল্লা, পান্তুয়া, লালমোহন, আমৃত্তি বানিয়ে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড থালায় স্তূপ করে সাজিয়ে সারি সারি রাখছে একটা টেবিলের উপর— ঢাকাঢাকির বালাই নেই গ্রাহকের ঠেলাঠেলি— সেসব খাবার নিশ্চিন্ত মনে কিনে খাচ্ছে সবাই। সবচেয়ে মজা লেগেছিল জিলিপি ভাজার দৃশ্যটা। গনগনে চুলোয় ইয়া বড় কড়াইতে প্রায় কানায় কানায় ভর্তি তেল ফুটছে টগবগিয়ে, একটা ফুটো মালাইয়ে জিলিপির গোলা নিয়ে নিপুণভাবে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে কড়াইয়ে ফেলছে কারিগর। ঐ প্যাঁচানোর ভঙ্গিটাই চমৎকার। একেতো কষ্টিপাথরে কুদে তোলা কালো কুচকুচে বলিষ্ঠ গড়ন তার আবার মালকোঁচা এঁটেছে ধব্ধবে সাদা ধুতিতে, মাথায় জড়ানো একটা লাল গামছা, খালি গা। হাত যত বেগে ঘুরছে তার চেয়ে বেশি বেশি গতিতে দুলছে তার মাজা— অপূর্ব সেই ভঙ্গি দেখে চারদিকে সবাই হেসে গড়াগড়ি।

আমাদের স্কুল থেকে সিনেমা দেখতে যাওয়ার দৃশ্যটাও কম মজাদার নয়। বড় ক্লাস থেকে ছোট ক্লাস পর্যন্ত মেয়েরা দু'জন দু'জন করে লাইন করে দাঁড়াবে। তাদেরকে দরকার মতো উপদেশ দেবেন স্বয়ং প্রিন্সিপ্যাল মিস আলফান্সো। প্রথম,পথে কেউ লাইন ভাঙবে না, ছেলে-ছোকরারা যেন কোনোক্রমেই লাইন ক্রস করে আসা-যাওয়া করার মতো ফাঁক না পায়। দ্বিতীয়, কেউ যেন খবরদার কথা না বলে, কিংবা ধানক্ষেতে বাতাস লাগার মতো একজন আরেকজনের গায়ে হেসে গড়িয়ে না পড়ে। তিনি লক্ষ্য করে দেখেছেন, কারণে অকারণে মেয়েদের এমনি করা অভ্যাস। তৃতীয়, সামনে তাকিয়ে সোজা হেঁটে চলে যাবে। চতুর্থ, প্রত্যেক ক্লাসের লাইনের সামনে-মাঝে এবং শেষে একজন করে টিচার থাকবেন যে কোনো রকম জরুরি অবস্থা মোকাবিলা করার জন্য। এমনি ঝাড়া একঘণ্টা আমাদের দাঁড় করিয়ে লেকচার দিয়ে গেট খোলা হবে যাত্রা শুরু করতে

এখন মোতিমহলে যাওয়া মানে রাস্তার এপার থেকে ওপারে যাওয়া— চট করেই চলে যাওয়া যেত কিন্তু মুকুল সিনেমায় একই প্রক্রিয়ায় যেতে পথে বেশ কয়েকটা ক্রস রোড পড়ে। আমরা একমনে হেঁটে পথ চলতাম— রাস্তার দুধারে এবং মোড়গুলোতে ভিড় জমে যেতো, রীতিমতো ট্রাফিক জ্যাম। পরিস্থিতির গুরুত্ব দেখে পেট ফেটে হাসি আসতো। তবুও হাসতে মানা। স্কুল থেকে বাইরে কোথাও নিয়ে যাওয়ার এই ছিল কায়দা-কানুন। সিনেমায় গিয়েছি সারা স্কুল-জীবনে মাত্র পাঁচবার— তাও মুকুল আর মোতিমহলে সীমাবদ্ধ। তাছাড়া অন্যান্য দু'এক জায়গায় নেয়া হয়েছে আমাদের, কিন্তু ঐটুকু গণ্ডীর মধ্যেই। মোতিমহলের পরে ঠিক ওয়াইজঘাটের ওপরেই রেলিং দিয়ে ঘেরা মস্ত একটা মাঠ ছিল নানারকম খেলাধুলার জন্য। নৌকা বাইচের সময় স্কুল কর্তৃপক্ষ আমাদেরকে বাইচ দেখতে নিয়ে যেতেন ঐখানে ঢাকা মিউনিসিপ্যালিটিতে বেবি-শোতে গিয়েছি কাছাকাছি একটা নরম্যাল ছিল (ছেলেদের)— সেখানে কয়েকবার গিয়েছি শিক্ষামূলক প্রদর্শনী দেখতে— চন্দ্র-সূর্য-গ্রহ-তারার আপেক্ষিক দূরত্ব ও গতিবিধি, মাধ্যাকর্ষণ শক্তির গুণাগুণ, জোয়ার-ভাটা, রঙের খেলা, এইসব দেখানো হতো সেখানে। পুরনো ঢাকার প্রাণকেন্দ্র ছিল সদরঘাট থেকে নবাবপুর রেলগেট পর্যন্ত। এরই মধ্যে অধিকাংশ স্কুল কলেজ সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান। সেগুলোর নাম আর এখানে উল্লেখ করলাম না, কারণ, ইতোমধ্যেই বিষয়বস্তু থেকে আমি অনেক দূরে সরে গিয়েছি।

ফিরে যাই আবার সিনেমার গল্পে। তিরিশের দশকের প্রথম দিকে মুকুল আর মোতিমহল বেশ জোরেসোরেই চলছিল। তারপর মুকুলের কর্তৃপক্ষ মোতিমহলটা কিনে নিয়ে তার নাম রাখলো রূপমহল, যে নামে আজও চলছে ইসলামপুর এলাকায় লায়ন সিনেমায় ব্যবসা বেশ জেঁকে উঠলো— এখানে বাংলা ছবি নয়, বোম্বাইয়ের হিন্দি ছবিই বেশি দেখানো হতো। তাতে উত্তেজক নাচ-গান, মারপিট এতই জনপ্রিয় যে দর্শক আর ধরে না! এখানে খেটে-খাওয়া মানুষের ভীড়। অত্যন্ত ঘিঞ্জি গলির মধ্যে অবস্থান নিয়েও এর উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হতে লাগলো। এখনও এর জনপ্রিয়তা অব্যাহত আছে। আরও একটি বড় সিনেমা হল আরমানীটোলা আনন্দময়ী স্কুলের উল্টোদিকে। এটি এখনও টিকে আছে। ব্রিটানিয়া টকিজ নামে ছোট্ট একটি সিনেমা হল, এখন যেখানটায় জেনারেল পোস্ট অফিস ঠিক সেখানটায় ছিল। এখানে শুধু ইংরেজি ছবি দেখানো হতো। পঞ্চাশের দশকের প্রথম দিকেই এটা উঠে গেছে। মানসী ও প্যারাডাইস নামে দুটি সিনেমাহল হয়েছিল কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রতিযোগিতায় টিকতে পারেনি। মোটামুটিভাবে ঢাকায় এই কটি মাত্র সিনেমা হল ছিল আমার জানামতে।

সমসাময়িক মেয়েদের মধ্যে সিনেমা দেখার সৌভাগ্য বলতে হবে আমার অতি সুপ্রসন্ন। তখনকার দিকে শিক্ষিত লোকেরা একটু উন্নাসিক ছিল এ বিষয়ে। তাদের ধারণা, সিনেমা? সিনেমা কি ভদ্দরলোকে দেখে নাকি? ওসব দেখে কারা? অশিক্ষিত-অর্ধ-শিক্ষিতরা আর মফঃস্বল শহর কিংবা গণ্ডগ্রাম থেকে যারা বিশেষ করে বায়োস্কোপ

দেখার জন্যেই ঢাকায় আসে তারা। আবার বাবা-মারও প্রায় ঐরকমই অভিমত ছিল— অত সিনেমা দেখলে ছেলেপিলে ফক্কড় হয়ে যায় কিন্তু...

কিন্তু বাবা মুকুল সিনেমার, কেন জানিনা, একখানা শেয়ার কিনেছিলেন। দাম একশ' টাকা ফলে প্রতি ছবির জন্য দুটো ফুল আর দুটো হাফ টিকিট (ফার্স্ট ক্লাসের) ফ্রি পাওয়া যেতো তাছাড়া প্রতিমাসে একটা ফ্যামিলি পাস। এগুলো সব অনর্থক বরাদ্দ হতো। তখনকার দিনে ফ্যামিলি বলতে শুধু বাবা-মা-ছেলে-মেয়ে বোঝাতো না। বাড়িসুদ্ধ সবাই— অর্থাৎ বাবা-মা, ডজনখানেক ছেলেমেয়ে, চাচা, ফুফু, মামা, মামী, আত্মীয়-স্বজন সবাইর জন্য পুরো ড্রেস সার্কেল ছেড়ে দিত। দরকার হলে আরও বাড়তি চেয়ার লাগিয়ে দিতে কোনো আপত্তি করতো না। তাও আমাদের যাওয়া হতো না। শুধু মুসলমান পরিবারেই নয়, হিন্দু পরিবারেও এমনি গোঁড়ামি ছিল বিভিন্ন কারণে আমাদের ক্লাসের ফার্স্ট গার্ল রমলাদের বাড়িতে পারিবারিক পর্যায়ে আসা-যাওয়া ছিল। ওর মা বলতেন, 'ছেলেমেয়ে নিয়ে সিনেমায় যাবো কেন? সিনেমা দেখবো আমরা শুধু স্বামী-স্ত্রী।' অর্থাৎ ছেলেমেয়েদের চক্র আলাদা— তারা যাবে বিয়ের পরে নিজেদের সংসার হলে। এত কড়াকড়ির মধ্যে থেকেও আমরা জীবনে মাত্র একবার এমনি মহাযাত্রা করেছিলাম। বড় মামা বৌ নিয়ে এলেন আমাদের বাড়ি দিন কয়েকের জন্য বেড়াতে— তাঁদের সম্মানে আমরা তিন ঘোড়াগাড়ি বোঝাই হয়ে গিয়েছি মুকুলে শিশির ভাদুড়ীর 'সীতা' দেখতে। এর প্রত্যেকটি দৃশ্য এবং সংলাপ আমার মনে আজ পর্যন্ত জ্বলজ্বলে হয়ে ফুটে আছে। এটি আমার জীবনের চতুর্থ সবাক চিত্র (অন্যগুলোর গল্প পরে বলছি)। তখন আমি ক্লাস ফাইভে পড়ি— সবে নানার সেকেলে নকশা করা উঁচু খাটের তলায় সতরঞ্চি কিংবা মাদুর পেতে দেয়াল ঘেঁষে বসে লুকিয়ে লুকিয়ে নানীর শেলফ থেকে বঙ্কিমচন্দ্রের গ্রন্থাবলী পড়ে শেষ করেছি। আমার কাছে সীতা তো ভালো লাগবেই। কী সুন্দর শেষ দৃশ্যে মাটি ফেটে দু'ভাগ হয়ে সীতাকে গ্রাস করলো আর সেই ফাঁক দিয়ে একটা পদ্মকলি উঠে এসে বাতাসে হেলেদুলে যেন বলতে লাগলো, 'কী? কেমন জব্দ!'

এর আগের ছবিগুলো দেখেছি স্বয়ং বাবার সাথে। তখন আমি খুবই ছোট, বাবার কাছেই বেশি ঘুরঘুর করতাম। গ্রীষ্মের লম্বা ছুটিতে মা তার ছেলেমেয়ে দেবর-ননদ নিয়ে কোলকাতায় বাপের বাড়ি যেতেন। বাবা তখন সলিমুল্লাহ হলের হাউস টিউটর, অতএব সব ছাত্র চলে না যাওয়া পর্যন্ত তার ছুটি হতো না। তাছাড়া বোর্ড অফিসে পরীক্ষার কাজ থাকতো। সব চুকিয়ে শ্বশুরবাড়ি যেতে তাঁর আরও দু-তিন সপ্তাহ কেটে যেতো। আমি বাবার গলা ধরে ঝুলে পড়তাম কিছুতেই মার সাথে যাবো না। এখন বুঝতে পারি বাবার কতো কষ্ট হতো, কিন্তু তখন মহানন্দে থাকতাম। বাড়িতে থাকতো একজন বুড়ি, পুরনো রাঁধুনী, একজন খেলাই (আজকাল যাকে বলে আয়া), দু'একজন পরীক্ষার্থী কাকা, বাবা ও আমি। নাওয়া খাওয়ার বাঁধাবাধি নেই, সারাক্ষণ আব্বুর সাথে সাইকেলে ঘুরতাম। বোর্ড অফিসে পিয়নদের সাথে বসে পেতলের রুলার দিয়ে প্রত্যেকটা খাতার প্রথম পৃষ্ঠার আধখানা চেপে ধরে নাম রোল নং লেখা আধখানা ছিঁড়তাম। মাদ্রাজী প্রফেসর

আইয়ার সাহেবের বাড়িতে প্রকাণ্ড একটা তক্তপোষের মতো ছাদের সাথে চারটে লোহার শেকল দিয়ে ঝোলানো, তারি ওপর বসে-শুয়ে দোল খেতাম সাধ মিটিয়ে, কখনো ঘুমিয়ে পড়তাম, সেই অবসরে আব্বু দাবা খেলতেন আইয়ার সাহেবের সাথে। এমনি যাযাবর জীবন কাটতো। কিন্তু আব্বু সময় পেলেই আমাকে গল্প শোনাতেন— ঘুমানোর সময়তো বটেই, অন্য সময়ও আর প্রতি সপ্তাহে সিনেমায় নিয়ে যেতেন মুকুলে। প্রথম দেখেছি বায়োস্কোপ— ইংরেজি ও বাংলা ছবি। শর্ত ছিল ওখানে কোনো কথা বলবো না শুধু দেখে যাবো। বাড়িতে এসে আদ্যোপান্ত গল্পটা তিনি আমাকে বলতেন। আমি ছবির সাথে গল্পগুলো মিলিয়ে নিতাম, কোথাও কোনো দৃশ্য ছুটে গেলে মনে করিয়ে দিতাম। তার অনেক দৃশ্যই মনে দাগ কেটে বসে আছে আজও যেমন 'কপালকুণ্ডলায়' কাপালিকের বীভৎস চেহারা, মড়ার খুলিতে করে সুরাপান; Sign of the Cross-এ রোম শহর পুড়ছে আর রাজা নীরো পরম উল্লাসে বীণা বাজাচ্ছে, Androcles and the Lion-এ এক্ষিথিয়েটারের মাঝখানে হাত-পা বাঁধা এন্ড্রোকিলিসকে ছিঁড়ে খাবার জন্য ক্ষুধার্ত সিংহ খাঁচা থেকে ছেড়ে দেয়া হলো। সিংহটা ছুটে এসে বন্দির পা চাটছে আর লেজ নাড়ছে আর একেকবার মুখে তুলে এন্ড্রোকিলিসকে দেখছে। আরও দেখেছি 'লরেল হার্ডি', চার্লি চ্যাপলিনের বেশ কটা ছবি। এখন সেগুলো ভাঁড়ামি মনে হলেও তখন খুব মজা লাগতো– হাসতে হাসতে পেটে খিল ধরে যেতো

এ সময় সবাক ছবি দেখেছিলাম তিনটে চণ্ডীদাস, সোনার সংসার আর প্রহ্লাদ কোনটা আগে আর কোনটা পরে ঠিক করে বলতে পারবো না এখন। 'চণ্ডীদাস' ভালো লেগেছিল গানগুলোর জন্য কানাকেষ্ট (কৃষ্ণচন্দ্র দে) গেয়েছেন :

'ছুঁয়োনা, ছুঁয়োনা বধু, ঐখানে থাকো
মুকুর লইয়া চাঁদ-মুখখানি দেখ...'

এর সবক'টি গানই 'হিট' হয়েছিল— সেগুলো এ যুগেও অচল নয়। যেমনি সুর তেমনি কথা আর সবচেয়ে সুন্দর হচ্ছে গাইবার ঢং, গলা যেন অন্তরের অন্তঃস্থল নাড়া দিয়ে গমগম করে বেজে উঠছে :

"ফিরে চল, ফিরে চল, আপন ঘরে
চাওয়া পাওয়ার হিসেব মিছে
আনন্দ আজ আনন্দরে।"

'সোনার সংসার' ধীরাজ ভট্টাচার্যের প্রথম ছবি। নায়ক যেমন সুদর্শন তেমনি কম বয়সী। বেশ জটিল গল্পের বাঁধুনী। জমিদার বাবুর খামখেয়ালি এবং 'স্বর্গধাম' হোটেলের ছেলেছোকরাদের হাসি-কৌতুক দুই-ই যেমন তরুণ নায়কের কাছে তেমনি দর্শকদের কাছে সমান উপভোগ্য। 'প্রহ্লাদ' যে বয়সে দেখেছি তখন চোখে ছিল স্বপ্নের ঘোর, মনে রূপকথার কল্পনা। প্রধান আকর্ষণ ছিল কাজী নজরুল ইসলামের অভিনয় নারদের ভূমিকায় প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করা হবে— সব আয়োজন সম্পূর্ণ, লোকজন ভীড় জমিয়েছে, নারদ গান গাইছেন :

'ভক্ত আমার মাথার মণি
ভক্ত আমার প্রাণের প্রাণ।'

গানের শেষে ছুঁড়ে ফেলে দেয়া হলো প্রহ্লাদকে অগ্নিকুণ্ডের মাঝখানে। অমনি ওপর থেকে পুষ্পবৃষ্টি আরম্ভ হলো, কোথায় গেল অগ্নিকুণ্ড! সেখানে এক মস্ত ফুলের পাহাড়। তারি চূড়ায় বালক হাসছে বসে চারদিকে ধন্য ধন্য রব উঠলো। এ ছবির আরেকটা দৃশ্য আমার বেশ মজা লেগেছিল ক্রুদ্ধ রাজা হিরণ্যকশিপু অত্যন্ত কর্কশ-গম্ভীর স্বরে জিজ্ঞেস করছেন, 'কৈরে, অর্বাচীন বালক, কোথায় তোর হরি?' সে হাসিমুখে জবাব দিল, 'তিনি সর্বত্রই। এমনকি রাজপ্রাসাদের এই থামের মধ্যেও তাঁকে পাওয়া যাবে।' রাজা প্রচণ্ড এক লাথি মারলো থামের গায়ে। অমনি আশ্চর্য এক সিংহমূর্তি বেরিয়ে এলো ঐ থাম ভেঙে দুখান হয়ে। বেরিয়েই হিরণ্যকশিপুকে নখ দিয়ে ছিঁড়ে তার নাড়িভুড়ি বের করে দিল। এ ছবির ভাবার্থ হচ্ছে, শিষ্টের পালন ও দুষ্টের দমন।... খুব ছোটবেলায় দেখা ছবি এটাই শেষ। এরপর বেশ কয়েক বছর আমার ছবি দেখা হয়নি

আমি যখন ক্লাস সিক্স-এ উঠলাম তখন মুকুল সিনেমা হলের একজন ডিরেক্টর রমণীমোহন বাবু আব্বুর কাছ থেকে ঐ একশ' টাকার শেয়ারটা কিনে নিলেন। সিনেমায় যখন যাওয়াই হয় না তখন ওটা আর রেখেই বা কী লাভ! তাছাড়া এখন থেকে আগের মতোই প্রত্যেক ছবির জন্য দুটো ফুলফ্রি ও দুটো হাফ ফ্রি টিকেট এবং মাসে একটা নয়, দুটো, ফ্যামিলি পাসের বরাদ্দ করে দিলেন রমণীমোহন বাবু। কারণ ইতোমধ্যেই মোতিমহলটাও ওরা কিনে ফেলেছেন। শেয়ার বিক্রি করে আব্বুর ডবল লাভ— তবুও সেই অনুপাতে সিনেমা দেখার সুযোগ আমরা নিইনি কখনো

খুব সম্ভব ১৯৩৬ সালে কলকাতা হাইকোর্টের এডভোকেট আব্দুল গফুর সাহেব আব্বুর খুব ঘনিষ্ঠ বন্ধু লায়ন সিনেমার মালিক কাদের সর্দারের এক ভাইঝিকে বিয়ে করলেন। ঐ পরিবারের সাথে আমাদেরও বেশ হৃদ্যতা গড়ে উঠলো। এরপর থেকে ঐখানে কিছু সিনেমা দেখেছি নির্বিচারে প্রায়ই হিন্দি, যেমন সুলোচনা অভিনীত 'বোম্বাই কি বিল্লি', 'আলী বাবা আওর চালিস চোর' ইত্যাদি। ক্রমশঃ যতই পড়ার চাপ বাড়তে লাগলো সিনেমা দেখা কমে এলো বেছে বেছে দু'চারটে ভালো ছবি দেখেছি ওপরের ক্লাসে উঠে। লায়নে দেখেছি King Solomon's Mines, Samson and Delila, Julius Caesar ইত্যাদি

ভারতীয় বাংলা ও হিন্দি ছবি দেখেছি প্রচুর, চল্লিশের দশকের মাঝামাঝি, বিয়ের পরে— তার আগে অনুমতি ছিল না। এখানে একটা ঘটনা উল্লেখ করে শেষ করি আমার কর্তা এক ছুটিতে ঢাকায় এসে প্রস্তাব দিলেন সব শ্যালক-শ্যালিকা সুদ্ধ সিনেমা দেখবার। বাবা-মাকে রাজি করানো মুশকিল। বলেন, 'ওরা সিনেমার কি বোঝে!' তখন সবচেয়ে ছোটটি ছিল এক বছরের, তার বড়টি তিন, তার বড়টি পাঁচ... অনেক জেদাজিদি করে শেষের দুটিকে বাদ দিয়ে পাঁচ বছরের নূরু পর্যন্ত পারমিশন মিললো। দলবল নিয়ে আমরা গেলাম রূপমহলে সেখানে ছবি চলছিল 'দিদি'। প্রধান চরিত্রে

সয়গল, চন্দ্রাবতী, শীলা। শুধু নুরু কেন তার ওপরের সুলতান আর নবাবের জীবনেও এটাই প্রথম ছবি। এদের আগের তিনটি বোন ক'দিন হয় স্কুল থেকে পিকচার হাউসে A Tale of Two Cities দেখে এসেছে, নইলে ওদেরও এটা প্রথম ছবি হতো। স্কুলের দায়িত্বে যাচ্ছে বলেই বাবা-মা আপত্তি করেননি। কিন্তু আমাদের সাথে যাওয়ার বেলায় বলেছিলেন, "ওর তো এই সেই দিন একটা ছবি দেখে এলো। ওরা না হয় থাক এত ঘন ঘন সিনেমা দেখা ভালো না।" যাই হোক, এত জোর জবরদস্তি করে তো গেলাম। বসেছি ড্রেস সার্কেলে। প্রথমে সব চুপচাপ। রুদ্ধ নিঃশ্বাসে দেখছি। স্কুলের পাঁচিলের ওপাশ থেকে শীলা টপকানোর আগে তার জুতো জোড়া এপাশে ফেললো, পড়লো এসে ঠিক ঐখানটায় বসে থাকা সয়গলের মাথায় তারপর সেও নিরাপদে এপারে এসে বসে কিছুক্ষণ গল্প সল্পের পর সবে সয়গল গান ধরেছে,

'স্বপ্ন দেখি প্রবাল দ্বীপে
তুলবো আমি বাড়ি
সাগর থেকে ঝিনুক এনে
গাঁথবো সোপান তারি
আমার তিন মহলা বাড়ি।'

গান শেষ না হতেই নূরু বলে, 'পানি খাবো।' ওকে কিছুতেই থামানো যায় না 'এখানে কোথায় পানি পাবো, বাড়ি যেয়ে খেয়ো, ভাইয়া, সোনা...।' কে কার কথা শোনে। উঠে আসতে ইচ্ছা করছে না কারোই অমন ছবি ফেলে। কর্তা মশাই তাকে কোলে তুলে নিয়ে আদর করে থামানোর চেষ্টা করছেন— তার একই গোঁ কিছুক্ষণ শক্ত হয়ে আঁকড়ে রইলো। তারপর তরতর করে বেয়েছেলে কোল থেকে নেমে নিজের চেয়ারে গিয়ে স্ক্রীনের দিকে পেছন ফিরে টিট হয়ে বসে রইলো ছবি শেষ না হওয়া পর্যন্ত বাড়ী ফিরে মহাকান্না...। আমরা তো অপ্রস্তুত। ওকে আইসক্রিম, লেমনেড, অনেক কিছু সাধা হয়েছিল, ও খায়নি নিজের জেদ বজায় রাখাতে।

বাপের বাড়িতে এত সুযোগ সুবিধা থাকা সত্ত্বেও ইচ্ছামতো সিনেমা দেখতে পাইনি, তাই বুঝি এখন আমি একেবারেই বেপরোয়া হয়ে গেছি। সিনেমা দেখা থেকে কেউ আর আমাকে নিরস্ত করতে পারে না তা সে স্ক্রিন ছোটই হোক আর বড়ই হোক। আজকাল ঘরে ঘরেই ভিসিআর– ইংরেজি, বাংলা, হিন্দি, উর্দু, কোনো বাছ বিচার নেই। তার ওপর আবার ফিল্ম সোসাইটিগুলো মদদ যোগাচ্ছেন— ব্রিটিশ কাউন্সিল, বাইসেন্টিনিয়াল হল, জার্মান কালচারাল ইনস্টিটিউট সর্বত্রই যাতায়াতের সুবিধা করে দিয়ে। মাত্র ক'দিনের মধ্যেই দেখলাম Gone with the Wind, Passage to India, African Queen. Erika's Passion, She Stoops to Conquer, Chariots of Fire.

...এবং ভবিষ্যতে এই তালিকা দীর্ঘ হতে থাকবে ক্রমশ।'

(সূত্র : চলচ্চিত্র পত্র, বাংলাদেশ চলচ্চিত্র সাংসদ ফিল্ম বুলেটিন, ২১ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৬, ঢাকা, পৃ. ১৯-২৬)

কিরণ শংকর সেনগুপ্তের দেখা চলচ্চিত্র

ঢাকার চলচ্চিত্র সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য পাওয়া যায় কবি ও রাজনীতিবিদ কিরণ শংকর সেনগুপ্তের লেখায়ও। কিরণ শংকর সেনগুপ্ত সাতচল্লিশের দেশ বিভাগের পর কোলকাতার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যান। নিচে তাঁর দেখা চলচ্চিত্রের বিবরণ তুলে ধরা হলো :

'আনন্দনগর

আমার ছেলেবেলায় ঢাকা শহরে তিনটি সিনেমা হল ছিল। আরমানিটোলায় পিকচার হাউস, সদরঘাটে সিনেমা প্যালেস এবং জনসন রোডে তদানীন্তন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেটের কাছারির অনতিদূরে মুকুল সিনেমা। তিনটির মধ্যে পিকচার হাউসই ছিল সর্বাপেক্ষা প্রাচীন প্রেক্ষাগৃহ। এ হলে মহিলাদের বসার আলাদা ব্যবস্থা ছিল হলের এক কোণে পর্দাপরিবেষ্টিত জায়গায়। কেননা হলটি ছিল একতলা। আমার জীবনের প্রথম বায়োস্কোপ আমি দেখেছিলাম এ হলেই আমার মা এবং বড় পিসিমার সঙ্গে। তখন ছিল সিনেমার নির্বাক যুগ। মনে পড়ে দেখেছিলাম 'পাপের পরিণাম', 'কৃষ্ণ সুদামা', 'দেবদাস' প্রভৃতি নির্বাক বাংলা ছবি। 'মাতৃস্নেহ' নামের একটি ছবিও ঐ সময়ে দেখেছিলাম বলে মনে পড়ছে। সিনেমা হলের সামনের দিকে একধারে পিয়ানো ও অন্যান্য বাদ্যযন্ত্র বাজানোর জন্য যন্ত্রীরা উপস্থিত থাকতেন এবং গল্পের সিচুয়েশন অনুযায়ী যন্ত্রসঙ্গীত বেজে চলতো যাতে দর্শক হৃদয় উদ্বেলিত হয়। করুণ দৃশ্যে বেহালা ও পিয়ানোর সহযোগে করুণ সুর, যুদ্ধ বা লড়াইয়ের সময় রণদামামার শব্দসৃষ্টি এবং আনন্দ কোলাহলের দৃশ্যকে দর্শক-মনে পৌঁছে দেয়ার জন্য দ্রুতলয়ে যন্ত্রসঙ্গীত চালনা এসব আমাদের মতো বহু কিশোরের মনে গভীর রেখাপাত করতো। ইংরেজি এবং বাংলা দু'ধরনের সুরই যন্ত্রীদের নখদর্পণে ছিল। তবে কোনো দৃশ্যের সিচুয়েশন অনুযায়ী তেমন উপযুক্ত গৎ বাদ্যযন্ত্র সহযোগে বাজাতে না পারলে সিনেমা হলের ভেতরের দর্শকরা মাঝে-মাঝে চিৎকার করে আপত্তি জানাতো। তখনকার দিনেও সিনেমার এ গৎগুলো সিনেমা দর্শকদের অনেকেরই প্রিয় ছিল এবং অনেক বাড়িতেও উৎসাহীরা অর্গান বা বেহালায় এ গৎগুলো বাজাতেন।

আরমানিটোলা হাইস্কুল থেকে পিকচার হাউসের দূরত্ব খুব বেশি ছিল না। স্কুলের টিফিনের সময় আমরা কয়েকটি কিশোর কোনো কোনোদিন দেয়ালে কাঠের ফ্রেমে সজ্জিত সিনেমার ছবিগুলো দেখতাম এবং টিফিনের সময় উত্তীর্ণ হওয়ার আগেই তাড়াতাড়ি ফিরে যেতাম সিনেমা হল এলাকার এটি জামরুল গাছ থেকে জামরুল সংগ্রহ করে। ঐ কিশোর বয়সে সিনেমা দেখার সুযোগ ছিল না কিন্তু চিত্রলোকের নায়ক-নায়িকা ও ছবিগুলোর নাম আমাদের প্রায় মুখস্থ হয়ে থাকতো। নির্বাক ছবির যুগে একটি সিনেমা হলে সপ্তাহে দুটি ছবি দেখানো হতো, প্রতি শনিবার ও বুধবার নতুন ছবি এবং কোলকাতার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে ঢাকা শহরেও নতুন নতুন ছবি প্রদর্শিত হতো। সিনেমার দর্শকের সংখ্যা তখন বেশি ছিল না, সন্ত্রাসবাদ ও স্বদেশী আবহাওয়ায় ঢাকার সামাজিক

জীবন লালিত ছিল বলে কিশোর ও যুবকদের সিনেমা দেখা বারণ ছিল তবু দলের দাদাদের চোখ এড়িয়ে সিনেমায় যে একেবারেই যেতাম না তা নয়। খুব অল্প বয়সে তো মা ও পিসিমাদের সঙ্গে মহিলাদের জন্য নির্দিষ্ট জায়গায় বসে বায়োস্কোপ দেখতাম, পরে যখন 'টকি'র যুগ এলো তখন অনেকটা বড় হয়েছি, পাড়ায় সঙ্গীদের দু'একজনকে নিয়ে ছবি দেখতে যেতাম। মনে পড়ে চণ্ডীদাস ছবি দেখে পাড়ায় ফেরার পথে আমাদের রাজনৈতিক দলের এক দাদার সামনে পড়ে গেলাম। কোথায় গিয়েছিলাম জানতে চাইলে জানিয়ে দিলাম গিয়েছিলাম সদরঘাটে বেড়াতে। তিনি আমাদের জামাকাপড় শুঁকলেন এবং জানালেন জামায় যখন এতো সিগারেটের গন্ধ তখন নির্ঘাৎ আমরা এতোক্ষণ সিনেমা হলেই বসেছিলাম।

নির্বাক যুগের ছবির স্মৃতি এখনো মন থেকে একবারে লুপ্ত হয়নি বাংলা ছবির কোনোটাই উল্লেখযোগ্য ছিল না। কিন্তু সাগরপারের বিদেশী ছবির নাম, চিত্রতারকাদের নাম আমাদের নখদর্পণে ছিল। স্কুল জীবনেই দেখেছিলাম চার্লি চ্যাপলিনের 'সার্কাস' ও 'গোল্ড রাশ' এবং রুডলফ ভ্যালেন্টিনো অভিনীত 'ঈগল'। জন ব্যারিমোর অভিনীত 'ভিলাভেড রোগ' দেখেছিলাম ঐ সময়েই লন চ্যানির 'হ্যাঞ্চব্যাক অব নটারডেম' এবং 'লন্ডন আফটার মিডনাইট'। ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস ছিলেন তখনকার দিনের ছবির হিরো, আমাদের প্রাণাধিক প্রিয় অভিনেতা। রোমাঞ্চকর এবং খুব দুঃসাহসিক কার্যকলাপের পূর্ণ ছিল তাঁর অভিনীত প্রথম ছবি : 'রবিন হুড', 'ব্লাক পাইরেট', 'দি থ্রি মাস্কেটিয়ার্স', 'গচো', 'থিব অব বাগদাদ'। চলচ্চিত্রের আদি যুগে রুডলফ ভ্যালেন্টিনোর জনপ্রিয়তা ছিল অসীম। শুনেছি হলিউডে ভ্যালেন্টিনোর অকাল মৃত্যুতে কেঁদেছিলেন সে দেশের বহু সুন্দরী, কেননা একজন সুপুরুষ অভিনেতা হিসেবে তিনি তাদের চিত্ত জয় করেছিলেন। এ অভিনেতার দুটি ছবি 'শেখ' এবং 'সন অব দি শেখ' দেখেছিলাম অনেক পরে যখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ পাস করে বেরিয়ে এসেছি। মনে পড়ে কিশোর অভিনেতা জ্যাকি কুগানের কথা চার্লি চ্যাপলিনের 'দি কিড' ছবিতে অভিনয় করে সে দর্শকচিত্ত জয় করে সুপরিচিত হয়েছিল। কিশোর বয়সে তার অপর একটি ছবি 'বাটনস' দেখেও মুগ্ধ হয়েছিলাম। আরো যে ক'টি নির্বাক যুগের ছবি সেকালে দর্শকদের আলোচনার বিষয় হয়েছিল তার মধ্যে ছিল 'ওয়ে ডাউন ইস্ট', 'বো জেস্ট', 'সেভেনথ হেভেন', 'ডরোথি ভার্নন অব হ্যাডন হল', 'দি সি বিস্ট', 'অ্যাক্রস টু সিঙ্গাপুর', 'স্টুডেন্ট প্রিন্স', 'ডেভিল অ্যান্ড দি ডিপ', 'মেট্রোপলিস', 'গার্ডেন অব আল্লা', 'ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্লিপস', 'ক্যামেলি', 'ইফ আই ওয়াজ এ কিং', 'লা মিজারেবলস'। তখনকার দিনের নামকরা ও জনপ্রিয় অভিনেতা-অভিনেত্রীদের মধ্যে ছিলেন চার্লি চ্যাপলিন, ডগলাস ফেয়ারব্যাঙ্কস, জন ব্যারিমোর, রোমান নোভারো, লিলিয়ান গিস, মেরি পিকফোর্ড, পোলা নেগ্রি, গ্রেটা গার্বো, জন গিলবার্ট এবং আরো কেউ কেউ। তখন চলচ্চিত্রের হয়ে ওঠা ব্যাপারটাই শুধু চলছে, প্রয়োজনীয় শিল্পমাধ্যম হিসেবে নয় আনন্দ সৃষ্টির উৎস হিসেবেই তখন পর্যন্ত বিবেচিত হতো তার যা-কিছু সার্থকতা। তবু এ

সময়েই তৈরি হয়েছিল এমন কয়েকটি ছবি, যা চলচ্চিত্রের ইতিহাসে স্থায়ী মর্যাদার আসন লাভ করেছে। এ ধরনের কয়েকটি ছবি ও তাদের চিত্রপরিচালকদের নাম স্মৃতি থেকে উদ্ধার করা যেতে পারে : টেন কমান্ডমেন্টস (সিসিল বি ডি মিলি), বার্থ অব এ নেশন, ইনটলারেন্স, ওয়ে ডাউন ইস্ট (ডি ডাবলু গ্রিফিথ), দি স্টুডেন্ট প্রিন্স, দি প্যাট্রিয়ট, অরফানস অব দি স্টর্ম (আর্নস্ট লুবিশ), গার্ডেন অব আল্লা, ফোর হর্সমেন অব দি অ্যাপোক্লিপস (রেক্স ইনগ্রাম), দি বিগ প্যারেড (কিং ভিডর), ডেথ অব সিগফ্রিড, মেট্রোপলিস (ফ্রিটস ল্যাঙ) ইত্যাদি প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পটভূমিকায় তৈরি দুটি ছবি 'দি বিগ প্যারেড' এবং 'দি সেভেন্থ হেভেন' আমার স্মৃতিতে স্মরণীয় হয়ে আছে। 'অল কোয়ায়েট অন দি ওয়েস্টার্ন ফ্রন্ট' বইটি লিখে স্মরণীয় হয়ে আছেন রেমার্ক তার এ বইটির নির্বাক যুগের চিত্ররূপও দর্শকদের মুগ্ধ করেছিল সে সময়ে। এখানে বলা দরকার বিশের দশকে কোলকাতা এবং ঢাকায় অনেক ছবি একই সঙ্গে মুক্তিলাভ করতো। এমনও হয়েছে দু'চারটি বিদেশী সদ্যনির্মিত ছবি কোলকাতার প্রেক্ষাগৃহে দেখার আগেই ঢাকায় প্রদর্শিত হয়েছে ঢাকার দর্শক সমাজের সিনেমা সম্পর্কে রুচি ও বোধগম্যতা তৈরি হতে পেরেছিল অজস্র বিদেশী ছবি দেখেই, কেননা দেশী ছবি তখন পর্যন্ত ছিল বেশ নিচুমানের। জয়দেব, নিষিদ্ধ ফল, চাষীর মেয়ে, দুর্গেশনন্দিনী, কৃষ্ণকান্তের উইল, কণ্ঠহার, কপালকুণ্ডলা, জনা, প্রফুল্ল, শাস্তি কি শাস্তি, চরিত্রহীন তবু আকর্ষণ করেছিল ঢাকার দর্শকদের, জয়দেব ছবিটি তো কয়েক মাস ধরে একটি ছবিঘরে প্রদর্শিত হয়েছিল। বোম্বাই থেকে প্রেরিত বেশ কিছু ছবিও এ সময় ঢাকায় দেখানো হতো। মনে পড়ে শ্রীমতি সুলোচনার (উত্তরকালে যিনি দাদাসাহেব ফালকে পুরস্কার পেয়েছেন চলচ্চিত্রে তার অবদানের জন্য) কয়েকটি ছবি দেখেছিলাম, 'নার্স' ও 'আনারকলি' ছবি দুটি যার অন্যতম। ঢাকার সিনেমা সম্পর্কে একটু বিস্তারিত লেখা হয়ে গেল কেননা তখনকার দিনে আজকের দিনের মতো ফিল্ম সোসাইটি না থাকলেও স্থানীয় ক্লাবে-রেস্তোরাঁয় শিক্ষিত সমাজে চলচ্চিত্রের শিল্পরূপ নিয়েও কিছু কিছু আলোচনা হতে শুনেছি। তখনকার দিনে স্বাধীনতা সংগ্রামের সুস্থ চিন্তার পাশাপাশি সিনেমার প্রভাব তেমন ক্ষয়কারী আবহাওয়ার সৃষ্টি করতে পারেনি, বরং একটি নতুন শিল্পমাধ্যম হিসেবে সিনেমা সাধারণ মানুষের মনের পরিধিকে বিস্তৃত করতে সাহায্য করেছিল।' (সূত্র : চল্লিশ দশকের ঢাকা, ১৯৮৪, ঢাকা, পৃ. ২১-২৩)।

সরদার ফজলুল করিমের দেখা চলচ্চিত্র

বিশিষ্ট বুদ্ধিজীবী, লেখক, প্রগতিশীল চিন্তাবিদ, রাজনৈতিক কর্মী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সরদার ফজলুল করিমও এক সময় অর্থাৎ চল্লিশের দশকে অনেক ছবি দেখেছেন। নিচে তাঁর দেখা ছবির বিবরণ :

'সিনেমা বিশারদ

এ স্মৃতিচারণের একটি জায়গায় সে যুগে সারা রাত জেগে সিনেমা দেখার 'পাপের'

কথা যখন আজকের নিজের ছেলেপিলের কাছে একবার বলেই ফেলেছি তখন সেকালে কত সিনেমা দেখেছি তার একটি লিস্টিই দিয়ে দিই তালিকাটি পেলাম ছেঁড়াখোঁড়া প্রায় ৪৫ বছর পুরনো একটি খাতার পৃষ্ঠায় এ লিস্টি দেখে আমার নিজের তো এখন গর্বই হয়। আর কিছু না হোক, সেদিনকার একজন 'সিনেমা এক্সপর্ট' বলে তো নিজেকে দাবি করতে পারি। কিন্তু তার চাইতেও মূল্যবান কথা, রক্ষিত এই লিস্টি থেকে বাংলা ছায়াছবির সেই কৈশোরকালের চিন্তাভাবনা, আকর্ষণ রুচির কিছু শিরোনাম এ কালের মানুষে পেতে পারে। সেজন্য তালিকাটির এ উদ্ধৃতি। সেকালে যে দু'একটি ইংরেজি ছবি আসতো তার নামও দেখছি খাতাটিতে মেলে। তাই তাও তুলে দেয়া হলো। সংখ্যাগতভাবে প্রায় 'সেঞ্চুরি'। সংখ্যার ক্রম না দিয়ে কেবল শিরোনামগুলো দিচ্ছি : মুক্তি, চণ্ডিদাস, বিদ্যাপতি, দিদি, অভিনয়, টারজানকি বেটি, খনা, অভিজ্ঞান, অচ্ছুৎ কন্যা, রিক্তা, দেবদাস, গৃহদাহ, পুকার, সাপুড়ে, গোরা, পরপারে, পায়ের ধুলো, পথের শেষে, বড়দিদি, রজতজয়ন্তী, অধিকার, অভিনেত্রী, শুকতারা, জীবন-মরণ, দুশমন, যক্ষের ধন, সাথী, পথ ভুলে, ঘরকি রানী, ডাক্তার, তরুণী, কলঙ্ক ভঞ্জন, মাদার ইন্ডিয়া, দি লায়ন হ্যাজ উইংস, লাইফ অব এমিল জোলা, দি ম্যান দে কুড নট হ্যাং, ক্রিমিন্যাল অব দি এয়ার, টাইফুন, শাপমুক্তি, দেশের মাটি, হাতে খড়ি, শর্মিষ্ঠা, দেবযানী, সোনার সংসার, রেবেকা, স্বামী-স্ত্রী, ভালোবাসা ও মায়ামৃগ, শিবরাত্রি, পুনর্মিলন, পরিচয়, খাজাঞ্চী, বিজয়িনী, গ্রহের ফের, চাণক্য, অমরগীতি, সার্জেন্ট মাডেন, দি বিস্ট অব বার্লিন, পথিক, ঠিকাদার, পরশমণি, রমা, কয়েদী, জেইলর, রাজকুমারের নির্বাসন, দি রেইনস কেইম, দি কোর্ট ড্যান্সার, রাজনর্তকী, মায়ের প্রাণ, উত্তরায়ন, আজাদ, পড়শী, প্রতিরোধ, অভয়ের বিয়ে, স্কুল ডেজ অব টম ব্রাউন, গ্রেট কম্যান্ডমেন্ট, কঙ্কণ, জীবন প্রভাত, দি বার্থ অব এ বেবী, নন্দিনী, বন্দি, শেষ উত্তর, দি ডিফিট অব দি জারমানস নিয়ার মস্কো, প্রিয় বান্ধবী, ভীষ্ম, বন্ধন।

এবার গুণে দেখুন! না! প্রায় ৪৫ বছর আগেকার জীবনের এদিক-ওদিকে দৃষ্টিক্ষেপকারী সেই কিশোর ছাত্রটিকে আমার খুব যে খারাপ লাগছে, এমন বলতে পারিনে। বরং একটু মমতা জাগছে এবং কৃতজ্ঞতাও। অন্তত তার খাতায় সিনেমা দেখার 'পাপের' এই সাক্ষ্যটি তুলে রাখার জন্য।' (সূত্র : চল্লিশের দশকে ঢাকা, ১৯৮৪, ঢাকা, পৃঃ ১১৪)

সনজিদা খাতুনের দেখা চলচ্চিত্র

অধ্যাপক ডক্টর কাজী মোতাহার হোসেনের কন্যা বিশিষ্ট সঙ্গীতজ্ঞ, শিক্ষাবিদ ও সংস্কৃতিবিদ ড. সনজিদা খাতুনের দেখা চলচ্চিত্রের বিবরণ এখানে তুলে ধরা হলো :

'খুব ছোটবেলার স্মৃতিতে, বয়স যখন ছিল ৫/৬ তখন সেগুনবাগানের বাড়িতে থাকি, মনে পড়ছে, আবছা মনে পড়ছে, ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আব্বু, আম্মু তাদের বড় মেয়ে ও মেজ মেয়েকে নিয়ে সিনেমায় গেলেন। আমরা সব দর্শক। সিনেমা কি কিছুই

বুঝি না, ঝাপসা স্মৃতিতে আছে যে, সেগুনবাগানে থাকতে বড়দিরা সিনেমায় গিয়েছিলেন।

আরো পরের কথা, আমি এসব কথা লিখেছি কোনো এক লেখায়, আমাদের বড় ফুফা ছিলেন একজন। তিনি থাকতেন ফরিদপুরে। খুব সৌখিন ছিলেন তিনি, শান্তিপুরী ধুতি পড়তেন। তো তিনি ঢাকায় এলে মাঝে মধ্যে আমাদের সিনেমায় নিয়ে যেতেন। একদিনের কথা মনে আছে ফুফা আমাদের সিনেমায় নিয়ে যাবেন, বাড়িতে কেমন একটা সাজ সাজ রব উঠেছে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন আমার সিনেমা দেখা হয়নি। কারণ মা জেদ ধরেছিলেন যে, আমাকে ইলিশ মাছ খেতে হবে তবেই সিনেমায় যেতে পারবো। ইলিশ মাছ আমি তখন মোটেই খেতে পারতাম না কিন্তু সিনেমায় যেতে পারবো সেই লোভে জোর করে ইলিশ মাছ খেতে গিয়ে বমি করে প্রায় অসুস্থ হয়ে পড়লাম, সিনেমায় যাওয়া হলো না। তখন আমি হাটখোলার নারী শিক্ষা মন্দির-এ পড়ি

আরেকদিনের কথা মনে পড়ছে বড়দি'র (যোবায়দা মির্জা) তখন বিয়ে হয়ে গেছে। দুলাভাই এসেছেন বাড়িতে, তিনি আমাদের সবাইকে ঘোড়াগাড়িতে বোঝাই করে মুকুল সিনেমায় নিয়ে গেলেন। মুকুল সিনেমা তখন ছিল সদরঘাটে কোর্ট বিল্ডিংয়ের উল্টোদিকে, এখন সেই মুকুল সিনেমার 'আজাদ' নাম হয়েছে তো তখন মুকুল-এ চলছিল 'দম্পত্তি' নামে একটি ছবি কিন্তু সে হলে টিকেট পাওয়া গেল না। দুলাভাই তো মহা অপমানিত হওয়ার মতো অবস্থা। তিনি আমাদের নিয়ে ঘোড়াগাড়িতে করে ঘুরতে ঘুরতে সম্ভবত জেলখানার কাছাকাছি একটি এলাকায় বোধ হয় তাজমহল নামে একটি সিনেমা হল ছিল, সেখানে গেলেন পরে এই হল আগুনে পুড়ে গিয়েছিল সে হলে 'ফরিয়াদ' নামে একটি ছবি চলছিল। সেটিই দেখলাম সেদিন। উর্দু বা হিন্দি— ঠিক কোন ভাষায় ছিল এখন মনে নেই। তখন ১৯৪৫ কি '৪৬ সাল হবে, সম্ভবত ক্লাস সেভেনে পড়ি।

বাবা এক সময় মুকুল আর রূপমহল— এ দুটি সিনেমা হলের শেয়ার কিনেছিলেন। কি কারণে কিনেছিলেন জানি না, যদিও সিনেমা-টিনেমার ব্যাপারে তাকে কখনো আগ্রহী হতে দেখিনি শেয়ার ছিল বলে আব্বু ছবি দেখার পাস পেতেন, তখন এগুলোকে বলা তো পারমিট। তো অনেক বলে কয়ে আব্বুকে সিনেমায় যাওয়ার সেই পারমিট নিতে রাজি করাতেন বড়রা, তারপর সিনেমায় যাওয়া হতো আমাদের এভাবে এক সময় 'জীবন-মরণ' নামে একটি ছবি দেখেছিলাম। তাতে সায়গল অভিনয় করেছিলেন। তখন দেখা আরেকটি ছবির নাম মনে আছে— 'সমাধান'। রবিন মজুমদার ও সন্ধ্যা রানী অভিনয় করেছিলেন এতে। দুটো ছবিই বেশ ভালো লেগেছিল।

'জীবন মরণ' ছবিটি বড় দুলাভাইয়ের সাথে গিয়ে আরেকবার দেখেছিলাম। তখন একটি মজার ঘটনা ঘটেছিল। ছবি দেখতে দেখতে আমার ছোট ভাই নুরু হঠাৎ বললো পানি খাবো হলের ভেতর পানি পাবেন কোথায়— কিন্তু দুলাভাই বললেন, একটু

অপেক্ষা করে পানি আসছে। একটু পরই পর্দায় একটি দৃশ্যে দেখা গেলো সায়গল পানি বা সোডা খাচ্ছেন। দুলাভাই বললেন, ওইতো পানি। শুনে সবার মুখে হাসি ফুটলো।

সে সময় 'উদয়ের পথে' নামে একটি ছবি বেশ সাড়া জাগিয়েছিল আমার মেজ মামা কোলকাতা থেকে এসেছিলেন একবার, তিনি বললেন, 'উদয়ের পথে' খুব ভালো ছবি, শিক্ষামূলক ছবি। জ্যোতির্ময় রায় ও বিনতা রায় ছিলেন সে ছবির শিল্পী, খুব আগ্রহ নিয়ে ছবিটি দেখেছিলাম। ছবিতে সমাজতন্ত্রের কথাবার্তা ছিল, গানগুলোও বেশ ভালো লেগেছিল।

আমি যখন স্কুলে পড়ি তখন নিয়ম ছিল ছাত্র-ছাত্রীদের দল বেঁধে সিনেমা দেখাতে নিয়ে যাওয়ার। সেভাবে দলবলে গিয়ে একটি ছবি দেখেছিলাম, নাম 'এ টেল অব টু সিটিজ' শরৎচন্দ্রের উপন্যাস নিয়ে তৈরি 'পরিণীতা' ছবিটিও তখন দেখেছিলাম ছবির নায়িকা ছিলেন সন্ধ্যা রানী

ইডেন কলেজে পড়ার সময় আমাদের বাসার নিচতলায় মিসেস জেহা নামে এক মহিলা থাকতেন। আমরা তাকে রাঙাদি বলে ডাকতাম। তার ছিল সিনেমা দেখার বাতিক। দুপুর বেলায় তিনি সিনেমা দেখার জন্য পাগল হয়ে যেতেন। তার সঙ্গী হয়ে মাঝে মধ্যে আমরা কেউ কেউ যেতাম। আমি বার দুয়েক গিয়েছি তার সাথে। তিনি বেশি দেখতেন হিন্দি ছবি। তার সাথে দেখেছিলাম 'দোস্ত' নামে এক ছবি খুব মারপিট ছিল সে ছবিতে।

পরবর্তীকালে দেখা ছবির মধ্যে আমার এখনো মনে আছে 'মাটির পাহাড়' ছবির কথা। এ ছবিতে বোবা মেয়ের একটি চরিত্রে অভিনয় করেছিল রওশন আরা নামে একটি মেয়ে, অপূর্ব লেগেছিল তার অভিনয় তখন আমি বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি।

সত্যজিৎ রায়ের সাড়া জাগানো প্রথম ছবি 'পথের পাঁচালী' আমি দেখি যে বছর এটি নির্মিত হয় সেই ১৯৫৫ সালেই। তখন আমি শান্তি নিকেতনে এমএ পড়ছি। বোলপুরে কি একটি হলে 'পথের পাঁচালী' চলেছিল। ছবি দেখার আগেই আমি বইটি পড়ে ফেলেছিলাম। প্রথম দেখায় ছবিটি আমার ততটা ভালো লাগেনি। 'পথের পাঁচালী' বইটি পড়ে আমি এমন অভিভূত হয়েছিলাম যে, উপন্যাসটির মধ্যে যে সৌন্দর্য ছিল, ছবিতে তা খুঁজে পাইনি। পরে ১৯৫৮ সালে অথবা ষাটের দশকের প্রথম দিকে হবে হয়তো, ঢাকায় 'পথের পাঁচালী' দ্বিতীয়বার দেখি, 'তখন অবশ্য প্রথম দেখার চেয়ে ভালো লেগেছিল।' (সূত্র : দৈনিক সংবাদ, ঢাকা, ২৩ জানুয়ারি, ১৯৯৪)

ক. আ. ই. ম. নূরুদ্দীনের দেখা চলচ্চিত্র

বিশিষ্ট গণযোগাযোগ বিশেষজ্ঞ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক কাজী আবু ইমাম মোহাম্মদ নূরুদ্দীনও ঢাকায় অনেক ছবি দেখেছেন। তাঁর দেখা চলচ্চিত্র অভিজ্ঞতার বর্ণনা পাওয়া যায়। তাঁরই নিজের লেখায় লিখেছেন তিনি :

HALF A CENTURY OF MOVIE WATCHING

I don't exactly recollect what was the first movie to which I was exposed and when. In all probability it was sometime in the early 1940s when the entire world was passing through one of the most critical phases of its history— when it was engulfed by the Second World War. I was just a kid then. I think the film must have been either "Toofan Mail" or "Hunterwali" in Hindi, a Wadia Movies Production with Nadia and John Cavas playing the major roles.

For me and for my brothers (one of them dead long back) it was very easy to go to the movies because my father was the Officer-in-Charge of Chitpur Pilice Station at Calcutta. There was a cimema hall called 'Regent' at Bheritola which was within his jurisdication. Nasiruddin, an orderly of my father, was unstrumental in getting me and my brothers introduced to the manager of the Hall, Mr Kaiser. As the children of the 'Bara Babu' of the Thana, we has free rides in teh bus and free entrances to the cinema hall. Taking advantage of the official position of our father, we used to supply 'free passes' to our relations and to others who would make requests for the same.

I "inherited" this habit of watching movies from my parents who used to go to the cinema halls for watching movies. They would accompany my maternal uncle, late Khan Bahadur AFM Abdur Rahman, who was a member of the Film Censor Board in undivided Bengal in the 1930s. Those were the days of Ahindra Choudhury, Pahari Sanyal, Dhiraj Bhattacharjee, Jahar Ganguli, Chhabi Biswas, Kanon Devi, Chandravati, Jamuna Devi, Renuka Roy, Ramola Devi and others. My father would sometimes tell intersting stories about these actors and actress. He had also a film actor friend whose name was Nawab and who migrated to Bombay in the late 1940s.

One film of the 1940s which has left an indelible impression on my mind was "Kismat", produced by Bomby Talkies ans starring Ashok Kumar and Mumtaz Shanti. One of our cousins (who is no more) took all of us, brothers and sisters, to the Roxy Cinema Hall where it was being screened and where it ran for more than three years at a stretch. I also saw "Shondhi" starring late Sumitra Devi at Minar Cinema Hall near Shyam Bazar. The propritor of the Hall was a friend of my father and so we (brothers and sisters) did not have to buy tickets. Some other films I vividly remember to have seen at Calcutta before the partition of the subcontinent were : Roti, Udayer

Pathey, Shahor Thekey Durey, Judge Shaheber Natni, Mukti, Shapurey, Bandhan, Basant, Chal Chal Re Naujawan, Pukar, Jhoola, Shaheed etc.

Movies-watching became almost a passion with me when my family moved to Dhaka after partition. I used to see movies, both Bangla and Hindi, regularly. At times I used to go to Brittania (near Gulistan), New Paradise (at Satraojha) and New Picture House (now Shabistan) to see English movies like A Street Car Named Desire, Bathing Beauty, Gone With the Wind, to name only a few. In those days the cinema halls of Dhaka would release new films from Calcutta and Bombay almost every week. This practice continued till 1954 when the import and sereening of Indian films, both Bangla and Hindi, were banned in erstwhile East Pakistan. During the Period from 1948 to 1954 I saw too many films. I can recollect the title of many of these films and the actors and actresses playing the major roles. I do believe that those were the 'golden' days of cinema in the subcontinent. The period produced some of the greatest actors and actresses of Indian filmdom— Dilip Kumar, Raj Kapoor, Dev Anand, Balraj Sahani, Nargis, Meena Kimari, Madhubala and Geeta Bali. The period had also the best music directors Naushad, Shankar-Jaikishen, C. Ramohandra, Madan Mohan, S.D. Burman and O.P. Nayyar.

Compared to movies that are made today, majority of those produced in the early 1950s might have been technically 'poor'. But it has to be admitted that those films had definite 'Edge' over today's films in other respects. Acting was superb, music was lifting, dialogues and lyric were of high standard, dances had no touch of vulgarity in them and the films has a message to deliver to the audience. The shows in the hall had packed to capacity crowed and the films used to run for several weeks. Movie-goers had developed a taste for 'good'— movies. A look at any of the films of Mehboob Khan, A.R. Kardar, S.U. Sunny, Kamal Amrohi, Amiya Chakraborty, V. Shantaram, Bimal Roy and Nitin Bose will bear out of the truth of the statement I have just made. Some of the films have gone down in history and have become classics. (সূত্র : প্রকাশনা স্মারক : বাংলাদেশের চলচ্চিত্র শিল্প, ইনস্টিটিউট অব মিডিয়া স্টাডিজ রিসার্চ এন্ড ডেভেলপমেন্ট, ১৯৯৪, ঢাকা।)

রাবেয়া খাতুনের দেখা চলচ্চিত্র

পুরনো ঢাকার চলচ্চিত্র সম্পর্কে বর্ণনা পাওয়া যায় বিশিষ্ট সাহিত্যিক রাবেয়া খাতুনের (জন্ম ১৯৩৫) স্মৃতিকথায়ও। 'স্বপ্নের শহর ঢাকা' (১৯৯৪) গ্রন্থে তিনি 'রূপমহল', 'মুকুল' (আজাদ), 'পিকচার হাউস' (শাবিস্তান), ও 'মানসী' হলের কথা উল্লেখ করেছেন। তার এই স্মৃতি অবশ্য চল্লিশ দশকের। 'রূপমহলে' ছবি দেখা সম্পর্কে তার বর্ণনা :

'সব রোববার বিকেলের চেহারা এক রকম ছিলো না। কোনো কোনো দিন মাধুর্য বাড়তো। সেদিন পায়ে হেঁটে নয়, ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে আসতাম। সঙ্গে মা, বাবা। রূপমহলে বায়োস্কোপ দেখতে এসেছি। দুপাশে জানালা বন্ধ, গাড়ির দরোজা খুলে যেতেই হলের ঝি নেমে আসতো মেয়ে ক্লাসের সিঁড়ি ভেঙে। রাস্তা পর্যন্ত দুদিকে টেনে দিতো কালো পর্দা। এর ভেতর দিয়ে মা-চাচীরা উঠে যেতেন মহিলা সংরক্ষিত স্থানে। নিচে পুরুষদের মতো ওপরে মেয়েদেরও শ্রেণী বিভক্ত আসন। একতলা হলের (যেমন পিকচার হাউস) ভেতরেও পর্দার ব্যবস্থা ছিল। ছবি শুরু হলে ঝি পর্দা সরিয়ে দিতো।.... সিনেমা হলের মঞ্চে ঝুলতো চকচকে নকশাদার সার্টিনের পর্দা দু'ধারের দেয়ালে ডানা মেলা দেবদূত শিশুর ছবি অথবা শিথিলবসনা পরীর ঝলমলে রঙিন প্রতিকৃতি।' (পৃ. ১৭)।

লিখেছেন আরো তিনি, 'বোবা নির্বাক যুগ পেরিয়ে পর্দার নায়ক-নায়িকারা তখন কথা বলছে। গান গাইছে। দুর্গাদাশের যুগ গিয়ে ছায়াছবির জগতের রাজকুমার প্রমথেশ বড়ুয়া। সিংগিং স্টার হিসেবে কুন্দন লাল সায়গল, উমা শশী, কাননবালা, পংকজ মল্লিক যথেষ্ট জনপ্রিয়। ধীরাজ ভট্টাচার্য, মলিনা, ছায়াদেবী চন্দ্রাবতী, অহিও চৌধুরী, ছবি বিশ্বাসের বাজার গরম রীতিমতো। কাননবালা, জহর গাঙ্গুলী জুটির 'মানময়ী গার্লস স্কুল', বড়ুয়ার 'মুক্তি' সবচেয়ে সুপারহিট ছবির পুরোভাগে ছিল।' (পৃ. ১৭)।

তাঁর মতে 'পিকচার হাউস' ছিল সবচেয়ে পুরনো ছবির ঘর আর 'মুকুল' (আজাদ) ছিল তখনকার সবচেয়ে আধুনিক প্রেক্ষাগৃহ (পৃ: ১৭) এবং 'মানসী' ছিল সর্বকনিষ্ঠ আধুনিক হল। লিখেছেন তিনি, '(মানসী) তবে জন্ম থেকে সুনাম-দুর্নামের অধিকারী। প্রথম বায়োস্কোপ শৈলজানন্দের 'জীবন-মরণ'। নামী চিত্রপ্রতিষ্ঠানে নিউ থিয়েটার্সের তো বটেই, নায়ক-নায়িকার ভূমিকায় সে যুগের রোমান্টিক জুটি নৃত্যশিল্পী লীলা দেশাই, সুগায়ক সায়গল। এ প্রথম থেকেই ভিড় আর ভিড়।' (পৃ. ২৫)। (সূত্র : স্বপ্নের শহর ঢাকা, ঢাকা, ১৯৯৪)

আহমদ রফিকের দেখা চলচ্চিত্র

বিশিষ্ট লেখক, বুদ্ধিজীবী ও চিকিৎসক আহমদ রফিক পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় অনেক ছবি দেখেছেন। এ সম্পর্কে তার অভিজ্ঞতার বিবরণ :

'প্রথম ছায়াছবি কবে দেখেছি এতকাল পর মনে থাকার কথা নয়। যতটুকু মনে

পড়ে, খুব সম্ভব ১৯৪৫ সালে, মধ্যবঙ্গের এক মফস্বল শহরের টাউন হলে খুব ঘটা করে কিছুদিন ছবি দেখানো চলে। স্কুলে পড়ি। দুই বন্ধু মিলে দেখতে যাই, ছবিটির নাম ছিল 'নারী'— ঐ বয়সে ঐ ছবি দেখা কতটা সঙ্গত ছিল সেই আমলে, তেমন প্রশ্নের সুযোগ থাকলেও সেটা বোধহয় কেউ আমলে আনেননি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য, সামনের সারিতেই বসা ছিলেন আমাদের এক শিক্ষক, চিরকুমার, তার বউদিকে সঙ্গে নিয়ে। বেশ মনে আছে রাতে বাসায় ফেরার পথে তারা দু'জন ছবির বিষয় ও অভিনয় নিয়ে বেশ রসিয়ে আলাপ করছিলেন

আসলে ঐ প্রথম ছবি দেখানো নিয়ে আমাদের আপাত-নিস্তরঙ্গ শহরটা যেন ঘুম ভেঙে জেগে উঠেছিল। বিকেল হতে না হতেই মোটর চালানোর শব্দ শুরু হতো, কেমন একটা সাজ সাজ ভাব সবার মধ্যে। তাই কদিনের জন্য সবাই যেন বয়স, পদমর্যাদা সবকিছু বেমালুম ভুলে গিয়েছিলেন। তারপর আবার আগের মতোই অবস্থা। প্রযুক্তির এমনই যাদু!

এরপর মাঝখানে বেশ কিছু সময় পার হয়ে গেছে। চল্লিশের দশকের শেষদিকে বা বলা যায় পঞ্চাশের দশকে ঢাকায় পড়তে এসে ঐ সময়টার অনেক ছবিই তো দেখেছি। সে সময়টা ছিল রাজনীতির এক গনগনে পর্যায়। আমরা তখন প্রগতিবাদী তথা বাম রাজনীতির বৃত্তে বাঁধা পড়েছি। প্রগতিশীলতার মাপকাঠিতে জীবনচর্চায় বিশ্বাসী হয়ে উঠেছি। ছবি দেখার ক্ষেত্রেও অই একই মানদণ্ড। আমরা কিছুসংখ্যক বন্ধু ঠিক করেছিলাম যে, বাংলা ছবি এবং প্রগতিশীল ইংরেজি ছবি ছাড়া দেখবো না। বলা যেতে পারে জাতীয়তাবাদী চেতনা ও আদর্শবাদের একই সঙ্গে প্রতিফলন

রূপমহল, মুকল এবং ব্রিটানিয়া এই তো ছিল ছবি দেখার আস্তানা। নাগরমহল, শাবিস্তানকে ঠাট্টা করে বলা হতো পাকিস্তান, যদিও অবাক কাণ্ড যে, এ শাবিস্তানে মাঝে মধ্যে ভালো ইংরেজি ছবিও দেখেছি। যেমন ড. জেকিল অ্যান্ড মিস্টার হাইড, লিজ টেলরের দুই-একটা ছবি (নাম মনে নেই)। আর বাংলা ছবি প্রধানত রূপমহল ও মুকুল প্রেক্ষাগৃহে। অবশ্য ভালো বাংলা ছবি দেখা এবং হিন্দি বা পাকস্তানি ছবি না দেখার একটা একগুঁয়েমি তখন মনে কাজ করেছে, সঙ্গত-অসঙ্গত বিবেচনা না করেই।

আসলে সে আমলে ছবি দেখাতেও এক ধরনের আবেগ কাজ করেছে। মনে আছে এক দুপুরে মুকুল-এ নতুন আসা 'বাবল' নামে একটি ছবি দেখে বেরিয়ে আসার সময় দেখি দুই দাদা (যদিও ভাইজান, তখনকার দিনে দাদা বলতেই অভ্যস্ত ছিলাম) হাসতে হাসতে প্রেক্ষাগৃহ থেকে বেরিয়ে আসছেন। পরে মনে হয়েছে, ছবিটা ছিল অতিশয় রোমান্টিক এবং ভাবালুতায় ঠাসা। সে সময়টা প্রগতিবাদী কথাবার্তা, আর সমাজ চেতনার মিশেল এনে ছবি করার একটা প্রবণতা গড়ে উঠেছিল, ছবির অন্যান্য দিকে গুরুত্ব না দিয়ে। সত্যজিৎ রায় এসে সেসব ধারণা পাল্টে দিলেন সেতো অনেক পরের কথা। উত্তম কুমারকেও প্রথম দেখি 'বসু পরিবার' ছবিতে। তখন তরুণ আদর্শবাদী, চৌকস, চকচকে দীঘল শরীর। সেখানেও ঐ সস্তা ভাবালুতা।

বলাবাহুল্য যে, তখনকার বাংলা ছবি মানেই কলকাতার ছবি।

ইংরেজি বা অন্য বিদেশী ছবির মধ্যে 'বিটার রাইস', 'গোল্ড রাশ' কিংবা 'মসিয়ে ভেঁদু' দেখে খুব ভালো লেগেছিল। চ্যাপলিনের ছবি আমাদের বয়সী সবারই খুব প্রিয় ছিল। অনেক অনেক পরে অভিসার প্রেক্ষাগৃহে দেখা দুটো ছবির কথা এখনো মনে রয়েছে 'সান ফ্লাওয়ার' আর 'বর্ন-ফ্রি'।

ষাটের দশকে আমাদেরই দুই-একজন বন্ধু-বান্ধবের চেষ্টায় (তারা আবার এক সময় প্রগতিবাদী রাজনীতির মানুষ ছিলেন) ভারতীয় বাংলা ছবি আমদানি বন্ধ হয়ে যায়। যুক্তিটা ছিল খুবই কাঁচা, অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য হলেও আমি সঠিক মনে করি না। এর পরিণাম প্রতিযোগিতাহীন একমাত্রিক অধিপত্যের সুযোগ, আর সে কারণে মাত্র গুটিকয় ব্যতিক্রম বাদে স্বদেশী ছবি বোম্বাই-ঢং-এ যা তৈরি হয়েছে, তা এতই নিম্নমানের এবং দেখার অযোগ্য যে, প্রশ্ন তোলা যায়, লাখ লাখ ফুট কাঁচা ফিল্ম নষ্ট করার অর্বাচীন অধিকার প্রযোজক-পরিচালকদের আদৌ রয়েছে কিনা? এগুলো নিয়ে আবার ঘটা করে পুরস্কারও দেয়াও হয়। তাই আরো নানা কারণে গত ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর ধরে প্রেক্ষাগৃহে ছবি দেখা আর হয়ে ওঠেনি— বিশেষ উপলক্ষে দুই-একটি বিদেশী ছবি দেখার কথা বাদ দিয়েই বলছি।

ইদানীং আমাদের ছায়াছবিতে ঐ যে বলে 'বাঁক নেওয়া', তেমন একটা সম্ভাবনা দেখা দিচ্ছে— জানি না কোন সত্যজিৎ এর হাল ধরবেন।' (সূত্র : দৈনিক সংবাদ, ১ মে, ১৯৯৪)।

আসিরুদ্দীন আহমদের দেখা চলচ্চিত্র

বিশিষ্ট চলচ্চিত্র সাংবাদিক, সমালোচক, নাট্যকর্মী ও মাসিক 'ঝিনুক' পত্রিকার সম্পাদক আসিরুদ্দীন আহমদ পঞ্চাশের দশক থেকে নিয়মিত চলচ্চিত্র দেখেছেন। ১৯৫০ থেকে ১৯৫৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত তিনি তার দেখা বিভিন্ন চলচ্চিত্রও প্রেক্ষাগৃহের নাম, তারিখ এবং টিকিটের মূল্যসহ ডায়েরিতে লিখে রেখেছেন। এখানে জনাব আসিরুদ্দীনের দেখা চলচ্চিত্রের নাম (হলসহ) দেখা হলো :

তারিখ	চলচ্চিত্র	হল
১২ জুন ১৯৫০	চন্দ্রলেখা	নিশাত
জুলাই ১৯৫০		
১২ জুলাই	সমাপিকা	রূপমহল
সেপ্টেম্বর ১৯৫০		
৪ সেপ্টেম্বর	সংকল্প	রূপমহল
নভেম্বর ১৯৫০		
১০ নভেম্বর	শীশমহল	নিশাত

ফেব্রুয়ারি ১৯৫১

১৭ ফেব্রুয়ারি	বিদ্যাসাগর	রূপমহল

মার্চ ১৯৫১

২০ মার্চ	দোভাই	প্যারাডাইস
২৮ মার্চ	নিশান	নিশাত

এপ্রিল ১৯৫১

৩ ও ৯ এপ্রিল	অভিনয় নয়	প্যারাডাইস
৩ ও ১৫ এপ্রিল	সনম	নাগরমহল

নভেম্বর ১৯৫১

১২ নভেম্বর	দিদার	মায়া
৪ ও ১৫ নভেম্বর	তারানা	নিশাত
২০ নভেম্বর	মেঝদিদি	রূপমহল
২৫ নভেম্বর	পিঁজরা	মুকুল

ডিসেম্বর ১৯৫১

২৮ ডিসেম্বর	দাস্তান	মুকুল

জানুয়ারি ১৯৫২

১২ জানুয়ারি	বাবাজী	মুকুল
১৫ জানুয়ারি	আশা	রূপমহল
২৫ জানুয়ারি	সেতু	রূপমহল

ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

১০ ফেব্রুয়ারি	নাজনীন	নাগরমহল
২০ ফেব্রুয়ারি	হামারেই বেটি	মুকুল
২৮ ফেব্রুয়ারি	মিনতি	রূপমহল

মার্চ ১৯৫২

৩ ও ২০ মার্চ	গোমস্তা	মায়া
৯ মার্চ	বাজার	নাগরমহল
১২ মার্চ	প্রত্যাবর্তন	মুকুল
১৫ মার্চ	দিকভ্রান্ত	রূপমহল
১৯ মার্চ	চমকি	নিশাত
২২ মার্চ	মদহোশ	নিউ পিকচার হাউস
২৯ মার্চ	চন্দ্রশেখর	মুকুল

এপ্রিল ১৯৫২

১ এপ্রিল	ওয়াতন	লায়ন
৩ এপ্রিল	আলবেলা	নাগরমহল

৫ এপ্রিল	জয়শংকর	রূপমহল
৮ ও ৯ এপ্রিল	শেষ উত্তর	রূপমহল
১২ এপ্রিল	মেলা	তাজমহল
১৫ এপ্রিল	দোপাট্টা	নাগরমহল
১৯ এপ্রিল	আজীব লড়কি	মায়া
১৯ এপ্রিল	পরদেশ	লায়ন
২২ এপ্রিল	বাগদাদ	রূপমহল
২৩ এপ্রিল	দাস্তান	নিশাত
৩০ এপ্রিল	শীশমহল	নিউ পিকচার হাউস

মে ১৯৫২

৯ মে	বাদল	মুকুল
১০ মে	নিশানা	প্যারাডাইস
১৫ মে	শ্রীমতিজী	নিশাত
১৭ মে	যোগাযোগ	রূপমহল
১৮ মে	মালহার	মায়া
১৯ মে	জীবননৌকা	নাগরমহল
২৩ মে	পাগলে	মায়া

জুন ১৯৫২

৪ জুন	খিলাড়ী	লায়ন
৫ জুন	মোতিমহল	মায়া
৬ জুন	নদীয়াকে পার	তাজমহল
৭ জুন	বাদল	রূপমহল
১৪ জুন	খুব সুরত	মায়া
২২ জুন	শেষ উত্তর	রূপমহল
২৪ জুন	বাহার	মায়া
২৮ জুন	আরাম	নিউ পিকচার হাউস
৩০ জুন	নাদান	লায়ন

জুলাই ১৯৫২

৮ জুলাই	রাজপুত	মায়া
১৮ জুলাই	সাজা	লায়ন
২০ জুলাই	মহাপ্রস্থানের পথে	মায়া
২১ জুলাই	দত্ত	রূপমহল
২৪ জুলাই	বাহার	নাগরমহল
২৫ জুলাই	আপনি ইজ্জত	তাজমহল

২৭ জুলাই	আন্দাজ	নিশাত
২৮ জুলাই	পেয়ার কি বাঁতে	লায়ন
আগস্ট ১৯৫২		
১ আগস্ট	শাবিস্তান	তাজমহল
৪ আগস্ট	বসন্ত	নিউ পিকচার হাউস
৮ আগস্ট	বড়িবহু	মায়া
১০ আগস্ট	দিওয়ানা	মুকুল
১৪ আগস্ট	স্পর্শমণি	রূপমহল
২৭ আগস্ট	তকদির	নিউ পিকচার হাউস
২৯ আগস্ট	বাহার	নাগরমহল
সেপ্টেম্বর ১৯৫২		
১ সেপ্টেম্বর	স্বপনা	নিউ পিচকার হাউস
১ সেপ্টেম্বর	অঞ্জাম	লায়ন
৪ সেপ্টেম্বর	সাকী	মুকুল
৫ সেপ্টেম্বর	বসু পরিবার	রূপমহল
৮ সেপ্টেম্বর	আন	নিশাত
১৪ সেপ্টেম্বর	সিন্দবাদ সেলর	মায়া
১৭ সেপ্টেম্বর	ফুলো কি হার	নিউ পিকচার হাউস
২২ সেপ্টেম্বর	সাথী	রূপমহল
অক্টোবর ১৯৫২		
৪ অক্টোবর	দুলারী	নিউ পিকচার হাউস
৫ অক্টোবর	মা	মুকুল
১০ অক্টোবর	পাশের বাড়ি	রূপমহল
১৬ অক্টোবর	আওয়ারা	মুকুল
১৯ অক্টোবর	বাজী	নাগরমহল
১৯ অক্টোবর	আওয়ারা	মুকুল
২৪ অক্টোবর	খয়রাত	লায়ন
২৬ অক্টোবর	শকুন্তলা	তাজমহল
৩০ অক্টোবর	আন	নিশাত
নভেম্বর ১৯৫২		
	দিদার	মায়া
	বাজী	নাগরমহল
	দো সিতারে	মায়া
	রানী ভবানী	রূপমহল

১২ নভেম্বর	মহারানী ঝানসী	লায়ন
১৫ নভেম্বর	নাজমা	তাজমহল
১৭ নভেম্বর	হামলোগ	মায়া
১৮ নভেম্বর	সোহাগ রাত	তাজমহল
২২ নভেম্বর	মংলা	লায়ন
২৩ নভেম্বর	গড়মিল	নিউ পিকচার হাউস
২৮ নভেম্বর	আবু হোসেন	রূপমহল

ডিসেম্বর ১৯৫২

১ ডিসেম্বর	নাজনীন	নিউ পিকচার হাউস
২ ডিসেম্বর	বেতার	নাগরমহল
৪ ডিসেম্বর	মঙ্গলা	লায়ন
৭ ডিসেম্বর	আবিদা	মায়া
১৬ ডিসেম্বর	জবানবন্দি	রূপমহল
১৮ ডিসেম্বর	কাজল	নিউ পিকচার হাউস
২১ ডিসেম্বর	সিন্দুর	লায়ন
২১ ডিসেম্বর	কাফিলা	মুকুল
২৩ ডিসেম্বর	কাফিলা	মুকুল
২৫ ডিসেম্বর	একট্রেস	নিউ পিকচার হাউস
২৫ ডিসেম্বর	মিনাবাজার	মায়া
২৬ ডিসেম্বর	সমর	মুকুল

জানুয়ারি ১৯৫৩

১ জানুয়ারি	আগ	মায়া
২ ও ৩ জানুয়ারি	নাওবাহার	নাগরমহল
৯ জানুয়ারি	ইন্দ্রজাল	রূপমহল
৯ জানুয়ারি	পথের দাবী	মায়া
১০ জানুয়ারি	গৃহস্তি	লায়ন
১৭ জানুয়ারি	কালিঘাটা	মুকুল
১৮ জানুয়ারি	ইন্দ্রজাল	রূপমহল
২১ জানুয়ারি	সানাই	নিউ পিকচার হাউস
২১ জানুয়ারি	রামজন্ম	মায়া
২৩ ও ২৪ জানুয়ারি	বাবুল	নাগরমহল
৩০ জানুয়ারি	নিরুদ্দেশ	মায়া
৩১ জানুয়ারি	সংসার	নিশাত

ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

১ ও ৩ ফেব্রুয়ারি	মোতিমহল	মুকুল
৩ ফেব্রুয়ারি	বাবলা	গুলিস্তান
৬ ফেব্রুয়ারি	সমাপিকা	নিউ পিকচার হাউস
৬ ফেব্রুয়ারি	চন্দ্রলেখা	লায়ন
১৩ ও ১৯ ফেব্রুয়ারি	আনমোল ঘড়ি	নিউ পিকচার হাউস
১৪ ফেব্রুয়ারি	দাগ	নাগরমহল
১৫ ফেব্রুয়ারি	সংসার	নিশাত
১৭ ফেব্রুয়ারি	দাসী	মায়া
১৯ ফেব্রুয়ারি	নীল দর্পণ	রূপমহল
২২ ফেব্রুয়ারি	দুলারী	রূপমহল
২৪ ফেব্রুয়ারি	মুকাদ্দার	মায়া
২৫ ফেব্রুয়ারি	নারীর রূপ	নিউ পিকচার হাউস
২৭ ফেব্রুয়ারি	দম্পতি	রূপমহল
২৮ ফেব্রুয়ারি	আনোখি দাস্তান	লায়ন

মার্চ ১৯৫৩

৫ মার্চ	১০০১ রজনী	গুলিস্তান
৭ মার্চ	জলজলা	মুকুল
৮ মার্চ	অনিবার্য	রূপমহল
১১ মার্চ	দাগ	নাগরমহল
১৫ মার্চ	মহল	নিউ প্যারাডাইস
২৪ মার্চ	মনকামিত	মুকুল
২৯ মার্চ	তারানা	লায়ন
৩০ মার্চ	খাজনা	মুকুল

এপ্রিল ১৯৫৩

৩ এপ্রিল	রাজা হরিশচন্দ্র	ডায়মন্ড (রংপুর)
৭ এপ্রিল	নাগিন	নাগরমহল
১১ এপ্রিল	বাহার	নাগরমহল
১৩ এপ্রিল	সংসার	নিশাত
১৪ এপ্রিল	ডাচম্যান	গুলিস্তান
২১ এপ্রিল	মেলা	গুলিস্তান
২২ এপ্রিল	সরগম	নিশাত
২৬ এপ্রিল	গোলাপ	গুলিস্তান
২৮ এপ্রিল	পারাস	নিশাত

৩০ এপ্রিল	মোলাকাত	নিশাত
৩০ এপ্রিল	নিশানা	নিশাত
মে ১৯৫৩		
৫ মে	যোগান	নিশাত
১৪ মে	বৈকুণ্ঠের উইল	রূপমহল
১৬ মে	হনুমান পাতাল বিজয়	মুকুল
২১ মে	পর্বত	মুকুল
২১ মে	অশ্রু	রূপমহল
২২ মে	সিসটার	লায়ন
২৪ মে	চন্দ্রশেখর	রূপমহল
২৪ মে	সিপাইয়া	লায়ন
২৯ মে	বাল্মীকি	মায়া
৩১ মে	বাওরে নয়ন	মুকুল
জুন ১৯৫৩		
৪ জুন	বাজার	নাগরমহল
৭ জুন	রাজরানী	গুলিস্তান
১০ জুন	গৌনা	গুলিস্তান
১১ জুন	শাবিস্তান	মুকুল
১২ জুন	গরিবী	নিশাত
১৩ জুন	সংগ্রাম	মুকুল
১৩ জুন	সরকার	রূপমহল
১৪ জুন	জাল	গুলিস্তান
১৫ জুন	বেকারার	লায়ন
১৫ জুন	সাজা	লায়ন
১৫ ও ১৮ জুন	পরছাঁই	মায়া
১৬ জুন	আরাম	নিউ পিকচার হাউস
২০ জুন	মেঘমুক্তি	রূপমহল
২৫ জুন	রত্নদ্বীপ	রূপমহল
২৮ জুন	হালচাল	মুকুল
৩০ জুন	নিশান	লায়ন
জুলাই ১৯৫৩		
২ জুলাই	পরছাঁই	মায়া
৩ জুলাই	পান্না	নাগরমহল
৬ জুলাই	শবনম	নিউ পিকচার হাউস

১৬ জুলাই	অনন্যা	রূপমহল
১৭ জুলাই	নির্দোষ	মুকুল
১৯ জুলাই	ডগ সিটি	মায়া
২৩ জুলাই	আদা	নিশাত
২৫ জুলাই	রাজপুত	নিউ পিকচার হাউস
২৮ জুলাই	শেষ উত্তর	মুকুল
৩০ জুলাই	পতঙ্গ	মুকুল
৩১ জুলাই	নাইয়া	নিশাত

আগস্ট ১৯৫৩

২ আগস্ট	সবক	নিউ পিকচার হাউস
৪ আগস্ট	হামলোগ	মায়া
৬ আগস্ট	মগরুর	নাগরমহল
৭ আগস্ট	দো ভাই	মুকুল
৮ আগস্ট	কংকাল	রূপমহল
১০ আগস্ট	দোপাট্টা	নিশাত
১৪ আগস্ট	বাবুল	গুলিস্তান
১৬ আগস্ট	ফুলো কি হার	নাগরমহল
১৯ আগস্ট	আন্দাজ	নিশাত
২১ আগস্ট	নওবাহার	মুকুল
২৮ আগস্ট	সয়লাব	লায়ন
২৮ ও ৩১ আগস্ট	আওয়াজ	গুলিস্তান

সেপ্টেম্বর ১৯৫৩

৩ সেপ্টেম্বর	জিদ্দি	মুকুল
৪ সেপ্টেম্বর	আওয়াজ	গুলিস্তান
৫ সেপ্টেম্বর	আন	নিশাত
৯ সেপ্টেম্বর	গোমস্তা	নাগরমহল
১০ সেপ্টেম্বর	আনহোনি	মায়া
১১ সেপ্টেম্বর	বিদুষী ভার্যা	নাগরমহল
১৪ সেপ্টেম্বর	দহেজ	মায়া
১৭ সেপ্টেম্বর	প্রত্যাবর্তন	রূপমহল
১৮ সেপ্টেম্বর	বার্ড অব প্যারাডাইস	মায়া
১৮ সেপ্টেম্বর	দাস্তান	গুলিস্তান
২৭ সেপ্টেম্বর	টু নাইট অ্যান্ড এভরি নাইট	গুলিস্তান
২৮ সেপ্টেম্বর	জ্বলতে দীপ	মায়া

৩০ সেপ্টেম্বর	ঘংরু	নিশাত
অক্টোবর ১৯৫৩		
২ অক্টোবর	আলাদিন ও আশ্চর্য প্রদীপ	নাগরমহল
৩ অক্টোবর	পতঙ্গ	মায়া
৬ অক্টোবর	১০৯ ধারা	নিশাত
১৫ অক্টোবর	নিরালা	মুকুল
১৬ ও ১৮ অক্টোবর	চাঁদনী	গুলিস্তান
২২ অক্টোবর	শাঘর	নাগরমহল
২৩ ও ২৫ অক্টোবর	বোরখা	মায়া
৩০ অক্টোবর	হাঁসতে আঁশু	মায়া
নভেম্বর ১৯৫৩		
২ ও ৪ নভেম্বর	চারদিন	মুকুল
৬ নভেম্বর	সাগাই	গুলিস্তান
৯ নভেম্বর	পেয়ার	মুকুল
১১ নভেম্বর	গৌনা	নিউ পিকচার হাউস
১২ নভেম্বর	সাকী	নাগরমহল
১৬ নভেম্বর	মালহার	মুকুল
১৭ নভেম্বর	সেতু	রূপমহল
২২ নভেম্বর	আম্বর	গুলিস্তান
২৩ নভেম্বর	জিঘাংসা	রূপমহল
২৪ নভেম্বর	দেবর	নিউ পিকচার হাউস
২৬ ও ২৯ নভেম্বর	বরসাত	মুকুল
২৭ নভেম্বর	সিপাইয়া	নাগরমহল
২৮ নভেম্বর	নাচ	লায়ন
ডিসেম্বর ১৯৫৩		
১ ডিসেম্বর	ঢোলক	গুলিস্তান
১ ডিসেম্বর	জুগনু	নিশাত
৩ ডিসেম্বর	রাজরানী	নিউ পিকচার হাউস
৮ ডিসেম্বর	পারাস	নিশাত
৮ ডিসেম্বর	সোহাগ রাত	নিশাত
৮ ডিসেম্বর	পরদেশ	নাগরমহল
১১ ডিসেম্বর	ছোটি ভাবী	নাগরমহল
১৩ ডিসেম্বর	বীর অর্জুন	মায়া
১৪ ডিসেম্বর	মেহবুবা	লায়ন

১৮ ডিসেম্বর	সরদার	মায়া
১৯ ডিসেম্বর	পাত্রী চাই	রূপমহল
২৭ ডিসেম্বর	বসন্ত	নাগরমহল
জানুয়ারি ১৯৫৪		
১ জানুয়ারি	সাঁইয়া	লায়ন
১৫ জানুয়ারি	নিষ্কৃতি	কনক (?)
১৬ জানুয়ারি	লায়লা মজনু	কনক (?)
২৯ জানুয়ারি	শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু	মায়ামহল (?)
ফেব্রুয়ারি ১৯৫৪		
১১ ফেব্রুয়ারি	বাজী	মুকুল
১২ ফেব্রুয়ারি	স্লেভ গার্ল	মায়া
১৪ ফেব্রুয়ারি	পেয়ার কি জীত	নাগরমহল
২০ ফেব্রুয়ারি	আঁধিরাত	মায়া
২৬ ফেব্রুয়ারি	আলবেলা	মায়া
মার্চ ১৯৫৪		
৩ মার্চ	কালীঘাটা	মকুল
১২ মার্চ	কানিজ	নাগরমহল
১৮ মার্চ	স্বয়ংসিদ্ধা	মুকুল
১৯ মার্চ	রাজমুকুট	মায়া
২৬ মার্চ	বাওরে নয়ন	মুকুল
এপ্রিল ১৯৫৪		
২ এপ্রিল	বুজদিল	মায়া
৩ এপ্রিল	গুমনাম	নিশাত
৯ এপ্রিল	ফ্রাংকেইনস্টাইন	নিশাত
৯ এপ্রিল	পাতাল ভৈরবী	নিউ পিকচার হাউস
১৩ এপ্রিল	সহযাত্রী	রূপমহল
১৭ এপ্রিল	অ্যারাবিয়ান নাইটস	মায়া
১৮ এপ্রিল	সওদাগর	লায়ন
৩০ এপ্রিল	সনম	নাগরমহল
মে ১৯৫৪		
১০ মে	পুতুল	রূপমহল
১৩ মে	সন্ধ্যাবেলার রূপকথা	রূপমহল
১৭ মে	খাজানা	মুকুল
২৭ মে	মদহোশ	লায়ন

জুন ১৯৫৪

৩ জুন	লাহোর	মুকুল
৪ জুন	রতন	মায়া
৫ জুন	আঁধিয়া	গুলিস্তান
৬ জুন	আপোষ	নাগরমহল
১৩ জুন	বাংলার মেয়ে	রূপমহল
১৪ জুন	শশী	নিশাত
১৬ জুন	লাহোর	মুকুল
১৯ জুন	যাদু	মায়া
২৬ জুন	রাঙামাটি	রূপমহল
২৮ জুন	হামলোগ	মায়া

জুলাই ১৯৫৪

৩ জুলাই	বেকসুর	নিউ পিকচার হাউস
৬ জুলাই	আনমোল ঘড়ি	গুলিস্তান
৮ জুলাই	শশী	নিশাত
১০ জুলাই	আঞ্জাম	নাগরমহল
১৩ জুলাই	সমাপিকা	মায়া
১৪ জুলাই	লা জওয়াব	নিউ পিকচার হাউস
২৩ জুলাই	দিল্লাগী	নাগরমহল
২৫ জুলাই	আরজু	মায়া

আগস্ট ১৯৫৪

৫ আগস্ট	একই গ্রামের ছেলে	রূপমহল
৬ আগস্ট	সিক্রেটস অব লাইফ	মায়া
৯ ও ২১ আগস্ট	দি অ্যানসার	গুলিস্তান
৯ আগস্ট	জীবনতারা	মুকুল
১০ ও ২৪ আগস্ট	পরছাঁই	মায়া
১৫ আগস্ট	বাত কি বাত	তাজমহল
২০ আগস্ট	দাগ	নাগরমহল

সেপ্টেম্বর ১৯৫৪

৮ সেপ্টেম্বর	শশী	নিশাত
১১ সেপ্টেম্বর	বড়ি বহিন	নাগরমহল
২৯ সেপ্টেম্বর	ইজ্জত	মায়া

অক্টোবর ১৯৫৪

৫ অক্টোবর	বিখরে মতি	লায়ন

৫ অক্টোবর	নখরে	লায়ন
৫ অক্টোবর	দুনে	লায়ন
৭ অক্টোবর	বালম	মায়া
৯ অক্টোবর	জিনাত	গুলিস্তান
১৬ অক্টোবর	অভিমান	মায়া
২৩ অক্টোবর	পুকার	লায়ন
২৪ অক্টোবর	হায়দরাবাদ কি নাজনীন	গুলিস্তান
নভেম্বর ১৯৫৪		
১১ নভেম্বর	বৈজু বাওরা	মায়া
ডিসেম্বর ১৯৫৪		
১১ ও ১৮ ডিসেম্বর	পুনম	নাগরমহল
১৫ ডিসেম্বর	বৈজু বাওরা	মায়া
২৬ ডিসেম্বর	নন্দরানীর সংসার	রূপমহল
জানুয়ারি ১৯৫৫		
১৯ জানুয়ারি	গোলাম	রূপমহল
২১ জানুয়ারি	হৈরত	রূপমহল
২৭ জানুয়ারি	কাতিল	নাগরমহল
ফেব্রুয়ারি ১৯৫৫		
৮ ফেব্রুয়ারি	ভগবান শ্রীকৃষ্ণ	রূপমহল
১০ ও ১৮ ফেব্রুয়ারি	ইলজাম	নিশাত
২৪ ফেব্রুয়ারি	পিয়ার কি মঞ্জিল	মুকুল
মার্চ ১৯৫৫		
৩ মার্চ	অভিনয় নয়	রূপমহল
১১ ও ১৭ মার্চ	হামারি বেটি	নিউ পিকচার হাউস
১৬ মার্চ	কাতিল	নাগরমহল
৩১ মার্চ	টেক্সি ড্রাইভার	নাগরমহল
এপ্রিল ১৯৫৫		
৪ এপ্রিল	খাতুন	গুলিস্তান
৫ এপ্রিল	মেজদিদি	রূপমহল
১৯ এপ্রিল	শামসির	মুকুল
২২ এপ্রিল	মানে না মানা	রূপমহল
২৪ এপ্রিল	বাইসাইকেল থিফ	মায়া
মে ১৯৫৫		
৪ মে	নিষ্কৃতি	গুলিস্তান

১০ মে	টেক্সি ড্রাইভার	নাগরমহল
২৫ ও ৩০ মে	নওকর	মায়া
২৭ মে	সোহানী	নিশাত
২৮ মে	বাদল	মুকুল
৩০ মে	দামান	গুলিস্তান
জুন ১৯৫৫		
২৮ জুন	বদনাম	লায়ন
জুলাই ১৯৫৫		
৫ জুলাই	নওকর	মায়া
১১ জুলাই	জলপরী	মুকুল
১২ জুলাই	পাশের বাড়ি	রূপমহল
১৪ জুলাই	সন্ধ্যাবেলার রূপকথা	রূপমহল
৩০ জুলাই (ঈদ)	শীশা	মায়া
৩১ জুলাই	অন্নদাতা	গুলিস্তান
আগস্ট ১৯৫৫		
১৪ আগস্ট	মাহফিল	নিশাত
১৬ আগস্ট	থিওডোরা	মায়া
১৯ আগস্ট	অনুরাগ	রূপমহল
৩০ আগস্ট	আলবেলা	মায়া
সেপ্টেম্বর ১৯৫৫		
৭ সেপ্টেম্বর	স্ট্যালিনগ্রাদ	মুকুল
১৪ সেপ্টেম্বর	বুলবুল	মায়া
১৮ সেপ্টেম্বর	অপবাদ	গুলিস্তান
অক্টোবর ১৯৫৫		
২ ও ১৯ অক্টোবর	ইনতেকাম	মায়া
৫ অক্টোবর	কুইন অব শিভা	গুলিস্তান
১৪ অক্টোবর	বহুদিন হুয়ে	মুকুল
২৫ অক্টোবর	ফল অব বার্লিন	গুলিস্তান
নভেম্বর ১৯৫৫		
১ নভেম্বর	নওজোয়ান	লায়ন
৭ নভেম্বর	ঝিল কিনারে	নিশাত
৮ নভেম্বর	বসু পরিবার	মায়া
১৪ নভেম্বর	তুফান	নাগরমহল
১৫ নভেম্বর	আনহোনি	মায়া

১৯ নভেম্বর	নজরানা	মায়া
২৩ নভেম্বর	জালান	নিশাত
২৫ নভেম্বর	জিদ্দি	গুলিস্তান

ডিসেম্বর ১৯৫৫

২ ডিসেম্বর	সহযাত্রী	গুলিস্তান
১৩ ডিসেম্বর	সমর	মায়া
২৩ ডিসেম্বর	সন্দীপন পাঠশালা	রূপমহল
২৫ ডিসেম্বর	ইভানহো	মায়া
২৫ ডিসেম্বর	মহল	মায়া
২৯ ডিসেম্বর	রাগরং	নাগরমহল

আলোকচিত্র

নবাব খাজা আহসানুল্লাহ। আহসান মঞ্জিলে ১৮৯৮ সালে বায়োস্কোপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেছিলেন

নবাব খাজা সলিমুল্লাহ। ১৯১১ সালে আহসান মঞ্জিলে বায়োস্কোপ প্রদর্শনের ব্যবস্থা করেন

ঢাকার জিন্দাবাহার লেনের হীরালাল সেন উপমহাদেশের চলচ্চিত্রের পথিকৃত

খাজা আতিকুল্লাহ। ঢাকার চলচ্চিত্রের অন্যতম আদি দর্শক

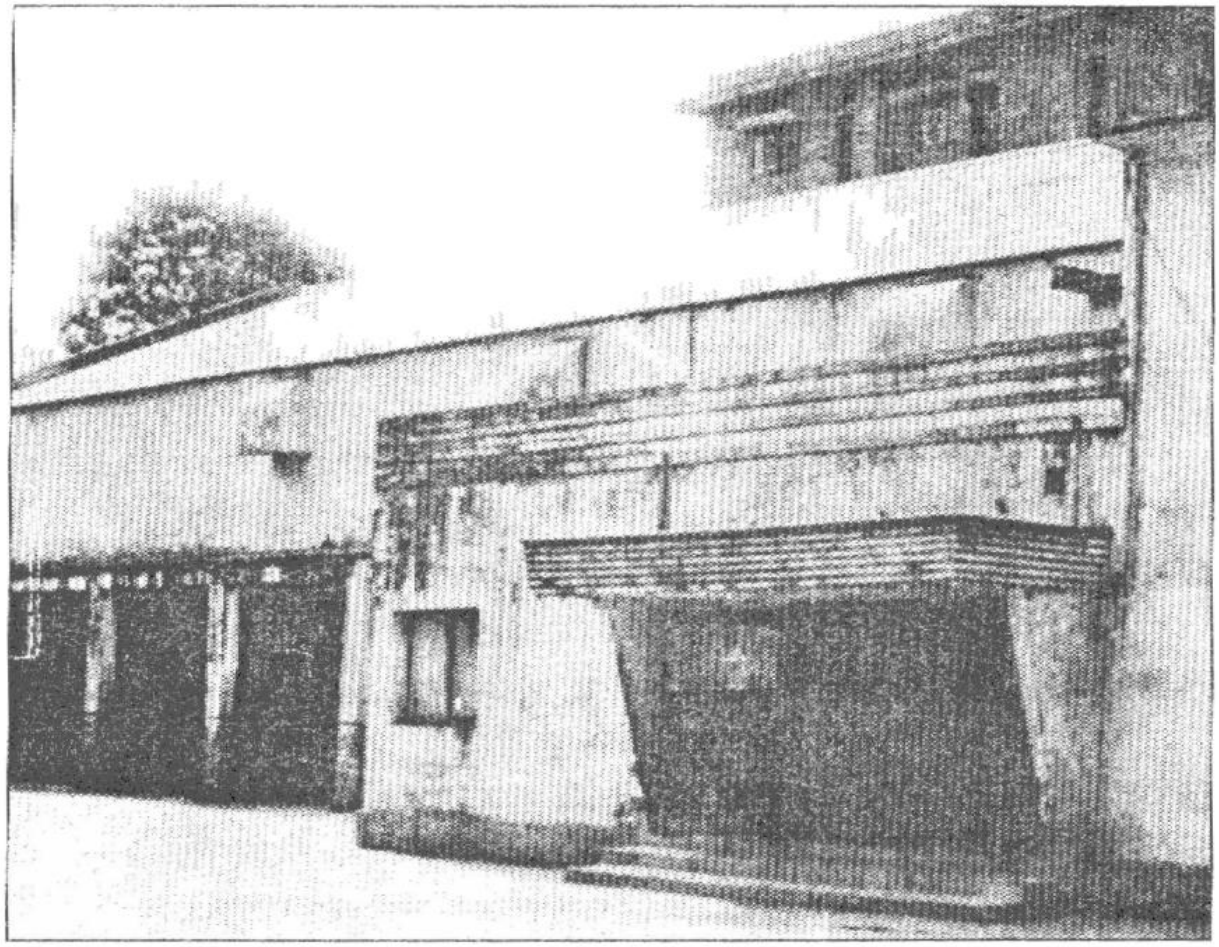

ঢাকার প্রথম স্থায়ী প্রেক্ষাগৃহ পিকচার হাউস, শাবিস্থান (আরমানিটোলা)

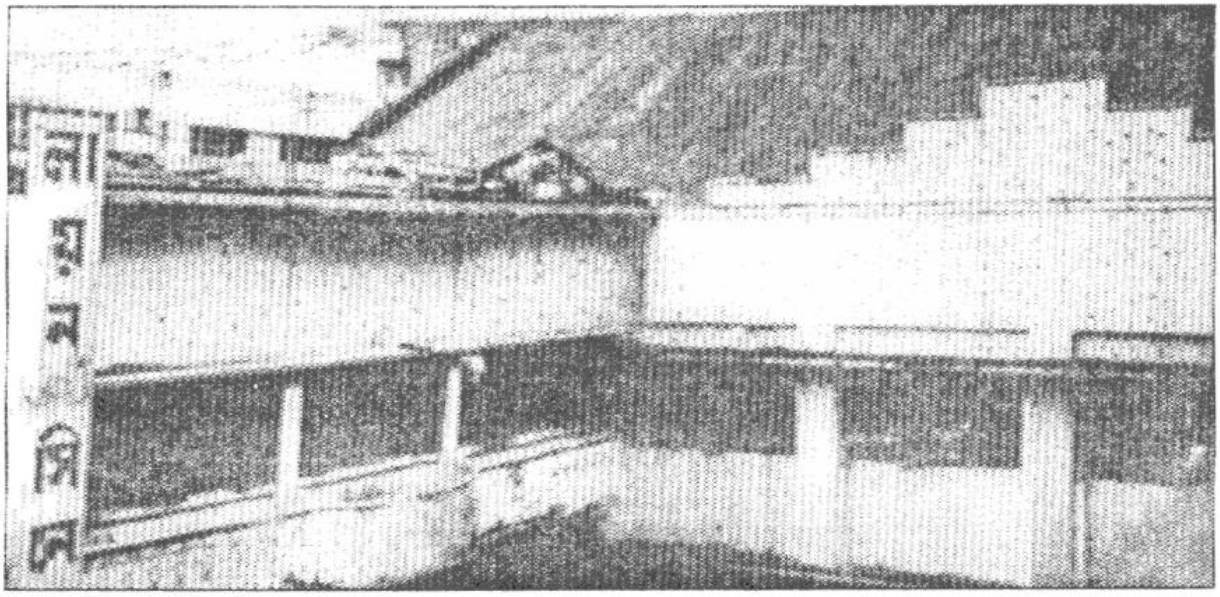

লায়ন সিনেমা হল

লায়ন সিনেমা হলের দুই প্রতিষ্ঠাতা মির্জা আব্দুল কাদের সর্দার ও মির্জা ফকির মোহাম্মদ

মুকুল সিনেমা হল। পরবর্তীতে আজাদ নামে পরিচিত। – ছবি : মোহাম্মদ আসাদ

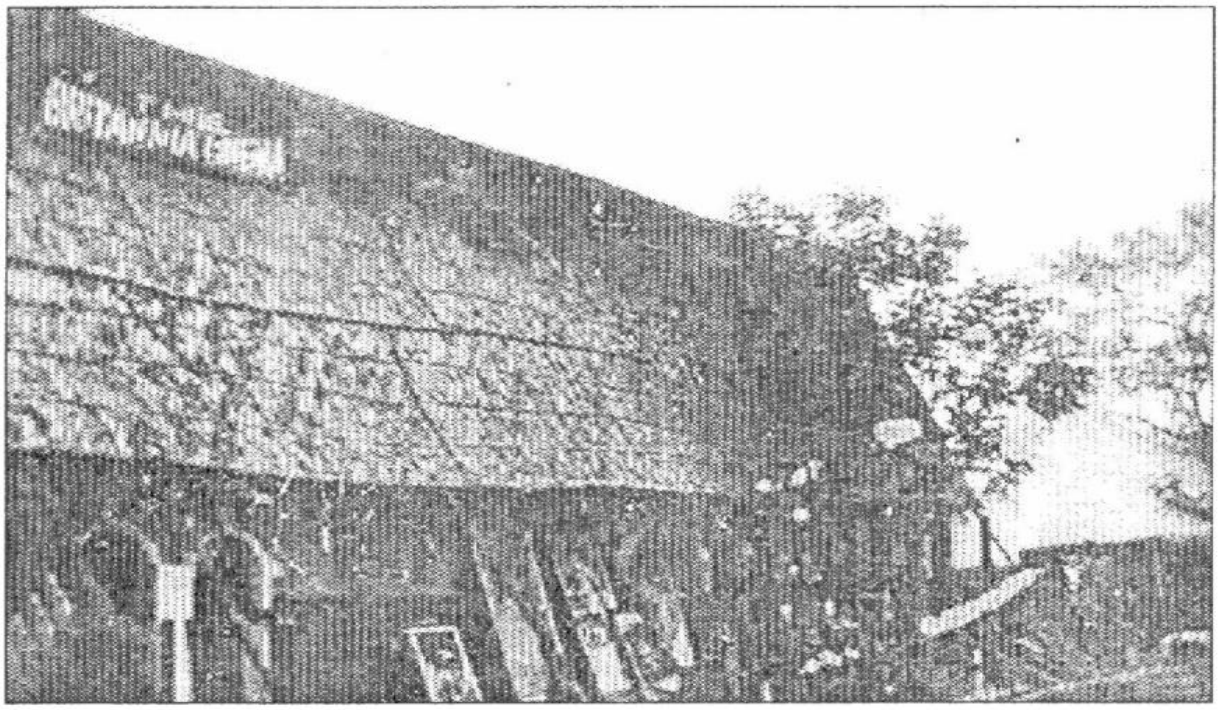

ঢাকার অবলুপ্ত সিনেমা হল বৃটেনিয়া। এখানে শুধু বিদেশি ছবি প্রদর্শিত হতো। এটির অবস্থান ছিল বর্তমান জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র সংলগ্ন। –সূত্র : ইন্টারনেট

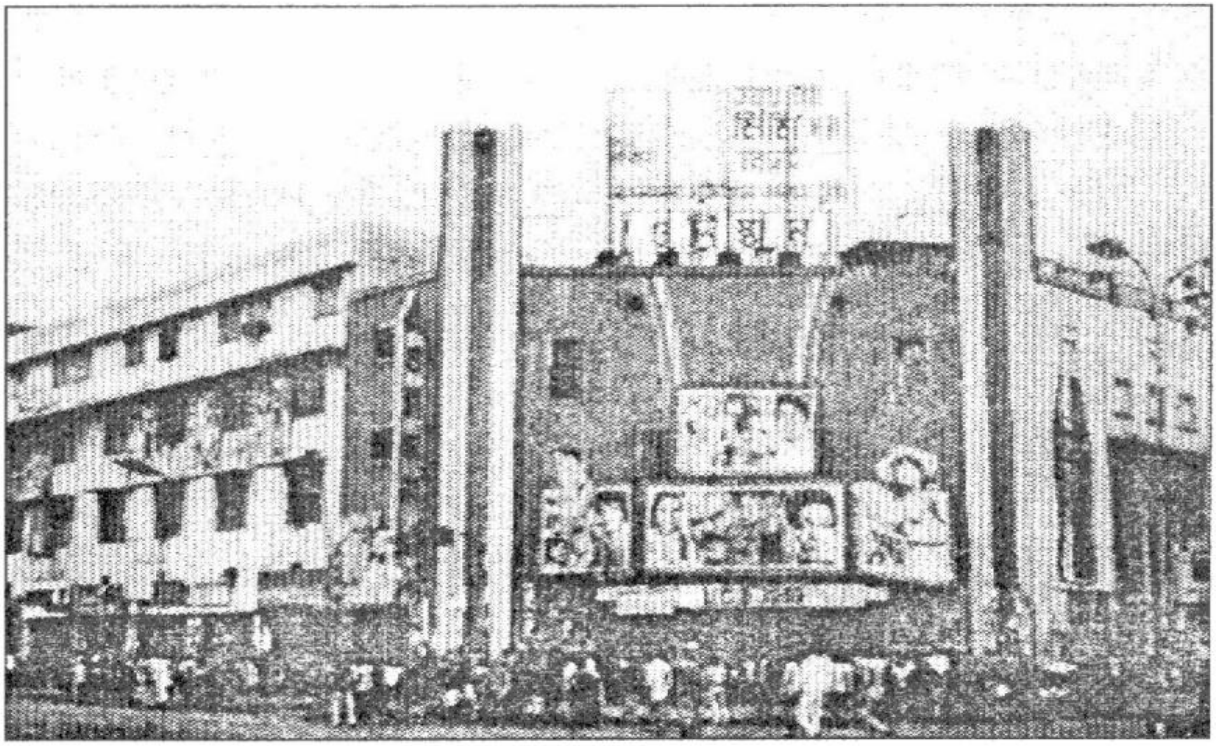

গুলিস্থান সিনেমা হল

ঢাকার প্রথম পরীক্ষামূলক চিত্র সুকুমারী ছবিতে নায়িকারূপী সৈয়দ আবদুস সোবহান ও নায়ক খাজা নসরুল্লাহ

খাজা আজমল। ঢাকার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্বাক কাহিনীচিত্র দি লাস্ট কিস-এর নায়ক ও প্রধান স্থপতি

ললিতা। ঢাকার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য নির্বাক কাহিনীচিত্র দি লাস্ট কিস-এর নায়িকা

দি লাস্ট কিস-এর বিজ্ঞাপন

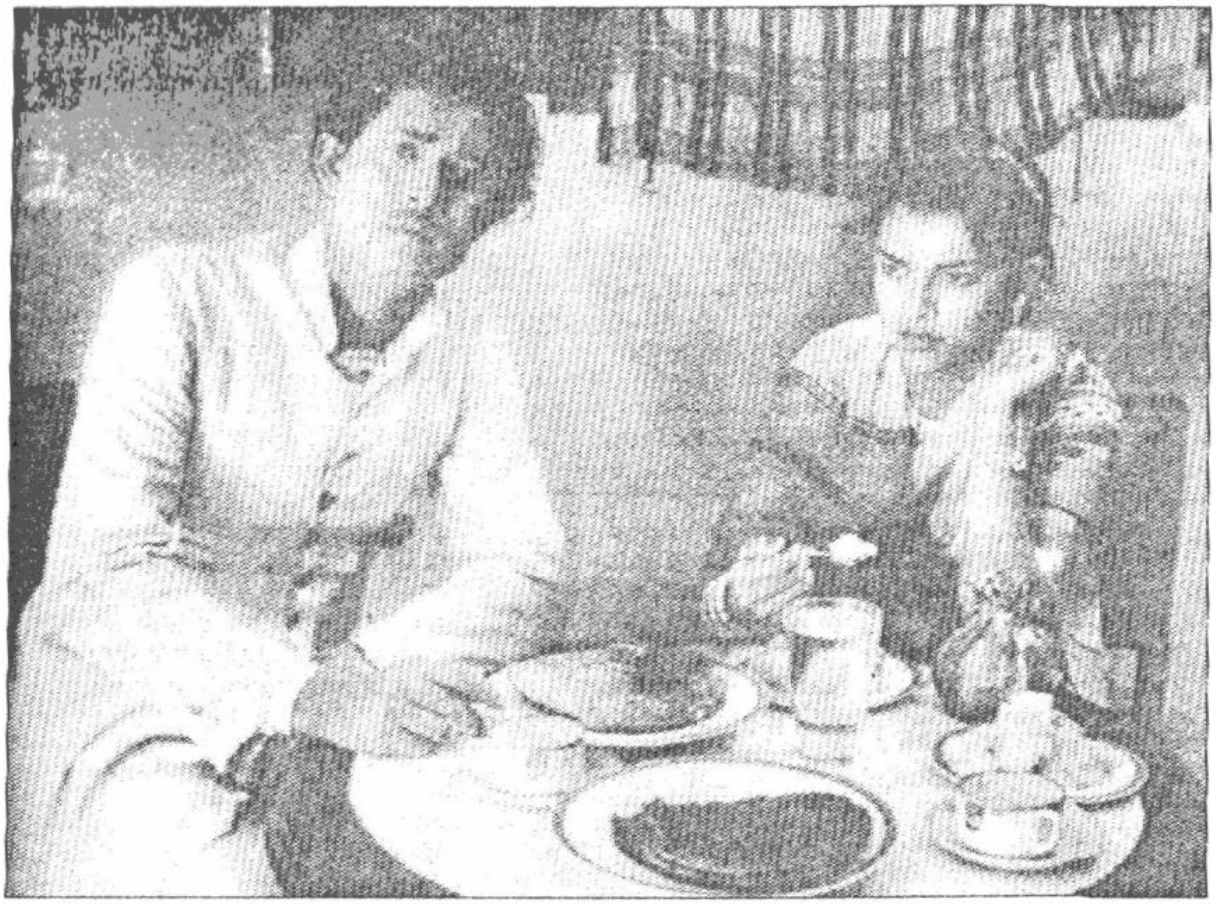

ঢাকার প্রথম পূর্ণদৈর্ঘ্য সবাক বাংলা ছবি মুখ ও মুখোশ-এর একটি দৃশ্যে আলী মনসুর ও জহরত আরা

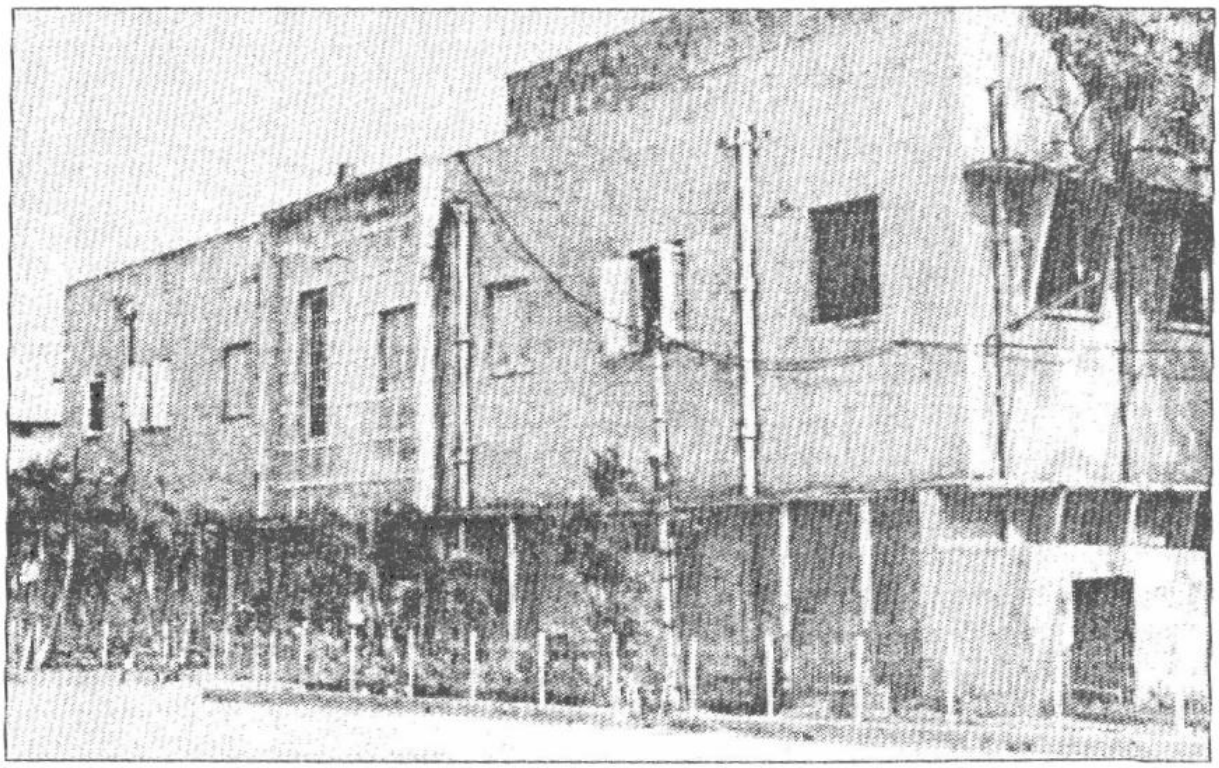

ঢাকার প্রথম ফিল্ম স্টুডিও এফডিসি'র প্রথম ভবন

মুখ ও মুখোশ-এর পরিচালক, প্রযোজক, কাহিনীকার ও নায়ক আবদুল জব্বার খান

এফডিসি'র রূপকার নাজির আহমদ

এফডিসি'তে নির্মিত প্রথম চিত্র আছিয়ার একটি দৃশ্যে শহীদ ও সুমিতা